আগস্ট প্রথম পক্ষ ২০২১ ■ শ্রাবণ ১৪২৮

# সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

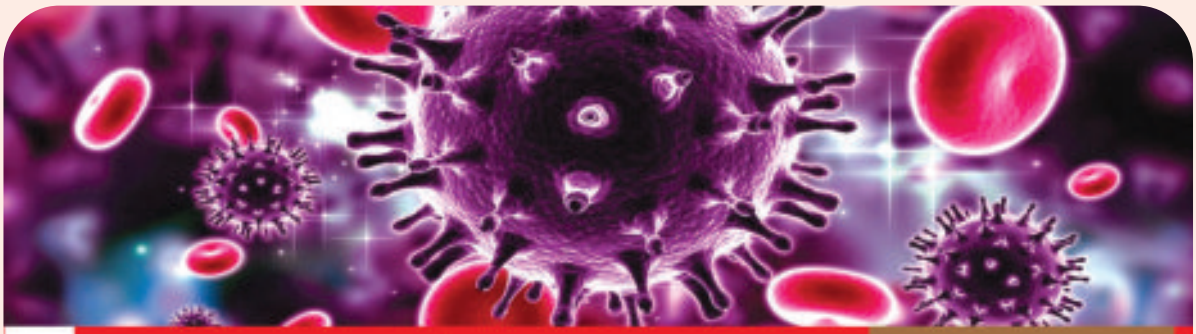

# করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

**গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।**

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

# সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

আগস্ট প্রথম পক্ষ ২০২১ ❑ শ্রাবণ ১৪২৮

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।
– অন্নদাশঙ্কর রায়

# সম্পাদকীয়

আগস্ট মাস বাঙালি জাতির শোকের মাস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরাজিত শক্তি প্রতিশোধ নেওয়ার ষড়যন্ত্রে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের আঁতাতে এদেশের কিছু বিপথগামী সেনাসদস্য ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করে। ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকীতে রইল বিনম্র শ্রদ্ধা। এ উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

জাতির পিতার সহধর্মিণী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী ৮ই আগস্ট। বঙ্গমাতার জন্মদিনকে 'ক' শ্রেণির জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য : 'বঙ্গমাতা সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক সহযাত্রী'। তাঁকে নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু খ্যাতনামা সাংবাদিক সায়মন ড্রিং ১৬ই জুলাই রুমানিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭১ সালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যা-নিধনযজ্ঞের খবর বহির্বিশ্বে পৌঁছে দেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জনমত সৃষ্টিতে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরবর্তীতে তাঁর হাত ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশে টেলিভিশন সাংবাদিকতা নতুন মাত্রা পায়। তাঁকে নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

৭ই আগস্ট বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮০তম মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতকার, চিত্রশিল্পী, নাট্যকার, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক। বিশ্বকবি বা কবিগুরু নামে তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁকে নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

প্রতিবছর ১ থেকে ৭ই আগস্ট পালিত হয় বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ। বিশ্বব্যাপী এবছর বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য: 'Protect Breastfeeding: A Shared Responsibility'। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

করোনা মহামারির এসময়ে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগের প্রকোপ বেড়ে গেছে। তাই করোনা মোকাবিলার পাশাপাশি এডিস মশা নিধনেও সচেতনতা প্রয়োজন। এ বিষয়ে রয়েছে নিবন্ধ। এছাড়া গল্প, কবিতা, অন্যান্য নিবন্ধ ও নিয়মিত প্রতিবেদন রয়েছে।

আশা করি, *সচিত্র বাংলাদেশ* আগস্ট প্রথম পক্ষ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।


**প্রধান সম্পাদক**
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

**সিনিয়র সম্পাদক**
হাছিনা আক্তার

**সম্পাদক**
ডায়ানা ইসলাম সিমা

**কপি রাইটার**
মিতা খান

**শিল্প নির্দেশক**
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

**সহসম্পাদক**
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

**অলংকরণ :** নাহরীন সুলতানা

**আলোকচিত্রী**
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

**সম্পাদনা সহযোগী**
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

**যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা**
ফোন : ৮৩০০৬৯৭
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

**গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ**
**সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
**চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর**
**তথ্য ভবন**
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

**মূল্য : পঁচিশ টাকা**

**গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা**


# সূচিপত্র

## প্রবন্ধ/নিবন্ধ


**নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই** ৪
প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু** ৭
প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

**রবীন্দ্রনাথ ও জাপান** ১৩
ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

**পনেরোই আগস্ট**
**বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বাংলাদেশ বেতার অপারেশন** ১৬
খালেক বিন জয়েনউদদীন

**সাহিত্যে 'বঙ্গবন্ধু-যুগ' কেন অনিবার্য** ১৯
প্রফেসর ড. মিল্টন বিশ্বাস

**যে তারিখ বাঙালিকে কাঁদায়** ২২
ড. শিহাব শাহরিয়ার

**তরুণ মুজিবের মানবিকতা ও সমাজ-সচেতনতা** ২৫
ড. সুলতানা আক্তার

**ইতিহাসের আলোয় জাতির পিতার মুখ** ২৭
ড. এম আবদুল আলীম

**জাতীয় শোক দিবস** ৩০
মিলন সব্যসাচী

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা অবিস্মরণীয় এক নারী** ৩২
আখতারুল ইসলাম

**বঙ্গবন্ধুর আইনি ভাবনা** ৩৪
সাহিদা বেগম

**বঙ্গবন্ধু ও যুবসমাজ** ৩৭
সুস্মিতা চৌধুরী

**বঙ্গমাতার ৯১তম জন্মবার্ষিকী জাতীয়ভাবে পালন** ৩৯

**সায়মন ড্রিং: ভুলবে না তোমায় বাংলাদেশ** ৪২
কাজী সালমা সুলতানা

**চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গু রোধে প্রয়োজন সচেতনতা** ৪৪
ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

**বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার দেশ** ৪৬
রেজা নওফল হায়দার

**মাতৃদুগ্ধ সৃষ্টিকর্তার নেয়ামত** ৪৭
শামসুন্নাহার বেগম

## গল্প

**যখন সমান্তরাল** ৪৯
রফিকুর রশীদ

**ধীরেন কাকার মুজিব কোট** ৫৬
সুজন বড়ুয়া

**কবিতাগুচ্ছ** ৫২-৫৫, ৬০-৬২
মুহম্মদ নূরুল হুদা, নাসির আহমেদ, মাকিদ হায়দার মুহাম্মদ সামাদ, দুখু বাঙাল, আরিফ মঈনুদ্দীন আসলাম সানী, শাফিকুর রাহী, অনিকেত শামীম আরিফ নজরুল, খান আসাদুজ্জামান, দিলরুবা শাহাদৎ, আ. শ. ম. বাবর আলী, সত্যজিৎ বিশ্বাস, জাহানারা জানি, খান চমন-ই-এলাহি, মঈনুল হক চৌধুরী, শেখ মো. মুজাহিদ নোমানী, মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ্, অমিত কুমার কুণ্ডু, দেবকী মল্লিক

## বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৬৩
প্রধানমন্ত্রী ৬৪
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৬৫
আন্তর্জাতিক ৬৬
উন্নয়ন ৬৬
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৬৭
শিল্প-বাণিজ্য ৬৮
শিক্ষা ৬৮
বিনিয়োগ ৬৯
নারী ৭০
সামাজিক নিরাপত্তা ৭০
কৃষি ৭১
পরিবেশ ও জলবায়ু ৭২
বিদ্যুৎ ৭২
নিরাপদ সড়ক ৭৩
স্বাস্থ্যকথা ৭৩
যোগাযোগ ৭৪
কর্মসংস্থান ৭৫
সংস্কৃতি ৭৫
চলচ্চিত্র ৭৬
মাদক প্রতিরোধ ৭৭
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৭৭
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৭৮
প্রতিবন্ধী ৭৮
ক্রীড়া ৭৯

**শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ চলে গেলেন গণসংগীতশিল্পী ফকির আলমগীর** ৮০

ফটোফিচার : নাজিম উদ্দিন

### ১৫ই আগস্ট
## জাতীয় শোক দিবস

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার বাবা-মায়ের আদরের সন্তান খোকা বাঙালি জাতির মুক্তির রাজনীতি করতে করতেই একদিন হয়ে ওঠেন শেখ মুজিব, শেখ সাহেব, মুজিব ভাই ও বঙ্গবন্ধু। মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধই তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিতে পরিণত করেছে। বাংলার জনপ্রিয় সংগ্রামী নেতা ও স্বাধীনতার সিংহপুরুষ বঙ্গবন্ধু দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আপোশহীন নেতৃত্বগুণেই কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা ও স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়ে জাতির পিতায় পরিণত হন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরামর্শ, সাহস, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা করেছেন। তিনি সহধর্মিণী হিসেবে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি কাজের প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধু যখন স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে কতিপয় বিপথগামী সেনাসদস্য কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা সপরিবার শহিদ হন। বিদেশে থাকায় বেঁচে যান তাঁদের দুই কন্যা– বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও মৃত্যু– এই দুই সত্যকে এক করে আগস্ট মাস প্রবলভাবে অর্থবহ। তিনি আছেন সহায়ক শক্তি হিসেবে গণমানুষের চেতনায়। তাঁর আদর্শে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। শোক যে শক্তির উৎস হয়, বাংলাদেশ তার প্রমাণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও তাঁদের পরিবার নিয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও প্রতিবেদন দেখুন, পৃষ্ঠা ৪-৪১


**ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন**
www.dfp.gov.bd
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

**মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস**
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

# নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই

**প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক**

পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতিকে চিরদিনের জন্য দুর্ভাগা জাতিতে রূপান্তরিত করেছে। একটি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কতিপয় বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে সপরিবারে নিঃশেষে জীবন দিয়ে গেলেন। সেই অভিশপ্ত পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যসহ যাঁরা শাহাদতবরণ করেন, তাঁদের সকলকে সমগ্র জাতি সর্বদাই বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করে।

ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা গেলেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে যে হত্যা করা অসম্ভব, তা নির্বোধ নৃশংস ঘাতকদের জানা ছিল না। ঘাতকদের সামনে নির্ভয়ে, নিরুদ্বেগ চিত্তে পাইপ হাতে বঙ্গবন্ধু যেভাবে আভিজাত্যের সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন তা বাঙালি জাতিকে দেশপ্রেম ও চরম আত্মত্যাগেরই শিক্ষা দেয়।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে প্রত্যাবর্তন করে রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সেদিন বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে। বাঙালি আর স্বাধীনতা হারাতে পারে না।'

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের একদিন পরই বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী করে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করে তিনি বঙ্গভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হন এবং ঘোষণা দেন আগামী দুদিনের মধ্যে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে মিলিত হবেন। এমন পরিবেশেও এক পর্যায়ে তিনি ঘরোয়াভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে দু'একটা বাক্য বিনিময় করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশে তাঁর কোনো বাণী আছে কি না এক সাংবাদিক জানতে চাইলে স্মিতহাস্যে বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুপ্রভাত' কবিতার চারটি পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করেন–

> উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
> ভয় নাই, ওরে ভয় নাই–
> নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
> ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

তিনি বলেন, 'আজকের দিনে জাতির উদ্দেশে এটাই আমার বক্তব্য। বিশ্বকবির এ অভয় বাণীই বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করুক এটুকুই আমার কামনা।' (অধুনালুপ্ত *আজাদ*, ১৩ই জানুয়ারি ১৯৭২)

প্রজাতন্ত্রের প্রভাবক্ষণে রবীন্দ্রনাথের 'সুপ্রভাত'ই বঙ্গবন্ধুকে অনুপ্রাণিত করেছে। নিঃশেষে সপরিবারে প্রাণদান করে বঙ্গবন্ধু সেই বিরল দৃষ্টান্তই রেখে গেলেন কবির ভাষায় যাকে আমরা বলতে পারি– 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ / মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগণ বিজয় অর্জন করে। আর তার পঁচিশ দিন পর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আরেকটি বিজয়। মুক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধুর পদার্পণ ছিল জাতীয় বীরের বেশে। যে কথা তিনি বলেছিলেন সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে– 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাল্লাহ'– অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর শিরা-ধমনীতে সর্বদাই প্রবাহমান ছিল বাঙালির স্বাধীনতা। এতটুকু নত হননি, দুর্বল হননি, মনোবল হারাননি। আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় ছিল তাঁর প্রবল। তাঁর উঁচু মাথা দেশের জনগণকে করেছে মহিমান্বিত। গোটা দেশের মানুষের বিপুল সমর্থনই তাঁকে করেছে দৃঢ়চেতা, আপোশহীন ও সদা দীপ্যমান। তাঁকে দিয়েছে বীরত্বের মহিমা। মৃত্যুভয়কে এড়িয়ে সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তোলার মধ্য দিয়েই তিনি উন্নীত হয়েছিলেন জাতির পিতার অভিধায় ও মর্যাদায়। বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতি হয়ে ওঠে অন্তর্লীন সত্তা। সমগ্র বিশ্বের মুক্তিকামী গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের অভিবাদন তিনি পাবেন সর্বকালে সর্বত্র। আর স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনে চুনকালি পড়েছিল পাকিস্তানি শাসকচক্রের মুখে, যারা লিপ্ত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে বাঙালি জাতিকে পদানত রাখার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে। নির্বিচারে শিশুসহ পাকিস্তানের বর্বরেরা হত্যা করেছে ত্রিশ লক্ষ সাধারণ মানুষকে, নির্যাতন-ধর্ষণ করেছে লক্ষ লক্ষ নারীদের, হত্যা করেছে দেশের শীর্ষ বুদ্ধিজীবীদের।

দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সার্থকতারও এক শীর্ষ মুহূর্ত। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও সাহসী। এই সাহসিকতা ও ন্যায়পরায়ণতাই তাঁকে অল্প বয়সে অধিষ্ঠিত করেছিল জাতীয় নেতার আসনে। পাকিস্তান

শাসিত বাংলাদেশে সকল প্রকার অন্যায় ঘোষণা ও দলন-পীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠই ছিল আগাগোড়া সবচেয়ে বেশি উচ্চ, সতেজ ও সোচ্চার। বঙ্গবন্ধুর প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ফলে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় তিনি কারাজীবন ভোগ করেন, যা বর্ণিত আছে বঙ্গবন্ধু রচিত গ্রন্থসমূহে।

গত শতকের ষাটের দশকে তুলনামূলক কম বয়সে আওয়ামী লীগের মতো একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের সভাপতি পদে ব্রত হয়েছিলেন তিনি। আর এরূপ দায়িত্ব পেয়ে বাঙালির মুক্তিকামনার বাইরে একটি মুহূর্তও তিনি অযথা ব্যয় করেননি। ১৯৬৬ সালে তাঁর উত্থাপিত ছয় দফা পরিণত হয়েছিল বাঙালির মুক্তিসনদে। এদেশের জনগণ তাঁর এই ছয় দফা দাবির সঙ্গে এতই একাত্ম হয়ে পড়েছিল যে শাসকশক্তি তাঁর কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার যত পরিকল্পনাই করুক, তা আর বাস্তবায়ন করতে পারেনি। গ্রেপ্তার, হয়রানি, মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসানোসহ নানা উদ্যোগ শাসকমহল থেকে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রতি জনগণের উত্তরোত্তর সমর্থন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সেসব চক্রান্ত কার্যকর হয়নি। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার সকল ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার পরও আইয়ুবের সামরিক শাসকশক্তি ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের প্রবল অভিঘাতে তাঁকে ঐ বছরের ২২শে ফেব্রুয়ারি শুধু নিঃশর্ত মুক্তি দিতেই বাধ্য হয়নি, বরং আইয়ুব নিজেই ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পড়ে। জনগণের শক্তি যে সব কিছুর ঊর্ধ্বে তা গভীরভাবে প্রমাণিত হয়। পরদিন অর্থাৎ ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তিনি ভূষিত হন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে। এই উপাধির মধ্যে মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা এত গভীরভাবে নিহিত আছে যে তাঁর নিজের নামটাই এর কাছে ঢাকা পড়ে গেছে। এখন তিনি বঙ্গবন্ধু নামেই বিশ্বব্যাপী সম্বোধিত হয়ে থাকেন। হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, বন্ধু ও বিশ্বের সকল নিপীড়িত-শোষিত মানবতার মুক্তিদূত অর্থাৎ বিশ্ববন্ধু।

আইয়ুবের পরিবর্তে আরেক সামরিক শাসক ইয়াহিয়া ক্ষমতাসীন হলেও জনদাবিকে অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সামরিক কালাকানুনের আওতাধীনে হলেও ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি তাঁকে পূরণ করতে হয়। জনগণের ওপর ব্যাপকভাবে আস্থাশীলতার কারণে বঙ্গবন্ধু ঐ কালাকানুনের মধ্যেই নির্বাচনে যেতে স্বীকৃত হন। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে এটি ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় লাভ করে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন সমগ্র পাকিস্তানেরই সর্বোচ্চ জননন্দিত নেতা। আর বাংলাদেশে তাঁর জয় ছিল একচ্ছত্র। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ছয় দফা, বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের শতভাগ সমর্থন প্রকাশ করে। সমগ্র পাকিস্তানের নির্বাচিত অবিসংবাদিত জননেতায় পরিণত হন বঙ্গবন্ধু।

কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্রের স্বভাববৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাঙালির গণরায়কে অস্বীকার করার ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে স্বীকৃতি দিতে, তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বরণ করতে, এমনকি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানেরও নানারকম টালবাহানার আশ্রয় নেয় সামরিক শাসকচক্র। ইয়াহিয়াকে এ ব্যাপারে প্ররোচিত করে পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং যৌথভাবে তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইয়াহিয়া সরকার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেও ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ তা স্থগিত করলে সমগ্র বাঙালি জাতি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, ক্ষোভে-রোষে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হয় বাঙালির অসহযোগ আন্দোলন। ১৯৭১ সালের ১ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত এই অসহযোগ আন্দোলনে বেসামরিক প্রশাসনসহ সমগ্র জনগণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্ব। ক্ষমতায় আনুষ্ঠানিকভাবে অধিষ্ঠিত না হলেও বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের নির্দেশেই পরিচালিত হয় তদানীন্তন সারা পূর্ব পাকিস্তান। একমাত্র সামরিক প্রশাসন ছাড়া পাকিস্তান সরকারের কর্তৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র মুখ থুবড়ে পড়ে। এই পটভূমিতেই বঙ্গবন্ধু তাঁর সাতই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতাকামী মানুষের সামনে তুলে ধরেন ভবিষ্যৎ করণীয়।

এ ভাষণে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও সেটিই ছিল স্বাধীনতার কার্যত (de facto) ঘোষণা। তিনি যখন বলেন যে, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে' এবং সবশেষে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– তখন তাঁর বক্তব্যের সারার্থ অনুধাবনে

*বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ*

কারো বেগ পেতে হয় না। এই ভাষণের পথ ধরেই বাঙালি জাতি প্রস্তুতি নিতে থাকে। আর ষড়যন্ত্রকারী সামরিক জান্তা প্রস্তুতি নিতে থাকে বাঙালির স্বাধীনতাস্পৃহাকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে দমনের। আলোচনার নামে শুধু সামরিক প্রস্তুতির জন্য কালক্ষেপণ করা হয়। অতঃপর পঁচিশে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর।

বঙ্গবন্ধু পঁচিশে মার্চ রাত ১২টার পর, অর্থাৎ ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক (de jure) ঘোষণা দেন। সামরিক বাহিনীর আক্রমণের নীলনকশা সম্পর্কে তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি অন্য সকল নেতাকর্মীকে আত্মগোপনে গিয়ে, এমনকি দেশত্যাগ করে হলেও স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। কিন্তু নিজে এর কোনো পথ গ্রহণ করেননি। কেননা সেটা তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষে মানানসই ছিল না। যিনি একটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচিত নেতা হিসেবে সরকার-প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাঁর পক্ষে আত্মগোপন করা কিংবা অন্য কোনো দেশে আশ্রয় প্রার্থনা শোভনীয় বলে তাঁর কাছে মনে হয়নি। তাছাড়া, পরে তিনি যা বলেছেন, পাকিস্তান সরকারের কাছে তিনিই বড়ো শত্রু, তাঁকে না পেলে পাকিস্তানি বর্বরেরা আরও ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠত; সেটা তিনি ঘটতে দিতে চাননি। বরং তার চেয়ে জীবনের সর্বোচ্চ ঝুঁকিই তিনি নিলেন। গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো পাকিস্তানে; সেখানে তাঁকে রাখা হলো কারাগারে। গোপন বিচারের মাধ্যমে তাঁর ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং কারাগারের পাশেই তাঁর জন্য কবর খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। এসব কিছুর মধ্যেই তিনি ছিলেন অবিচল। তাঁর এই অবিচলতার মূলে ছিল একটি দেশের সমগ্র মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। জনগণের স্বাধীনতাকামী সকল আবেগকে তিনি নিজ বুকে স্থান দিয়ে সকল ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন। বাংলাদেশে কী ঘটছিল সে সম্পর্কে তাঁকে কিছুই জানতে দেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে তাঁকে রাখা হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন তাঁর প্রতি দেশের প্রতিটি মানুষের গভীর ভালোবাসা সম্পর্কে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন মানুষের স্বাধীনতার আবেগ সম্পর্কে, যাকে সামরিক শক্তি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। এ বিশ্বাসই স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞায় তাঁকে অনমনীয় ও দৃঢ়চিত্ত রেখেছে। সাহস জুগিয়েছে তাঁর বুকে। মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বঙ্গবন্ধুকে সর্বদাই রেখেছে 'উন্নত শির', আপোশহীন, অসীম সাহসী ও জনবৎসল।

তিনি সামরিক জান্তার হাতে গ্রেপ্তার হয়ে তাদের কারাগারে আবদ্ধ থাকলেও বাংলার মানুষ তাঁকে এক মুহূর্তের জন্য ভোলেনি। বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত সাতই মার্চের ভাষণ মর্মে ধারণ করে মানুষ যুদ্ধ করেছে, বিপুল ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং পাকিস্তানি বাহিনীর সকল হিংস্রতা ও বর্বরতাকে মোকাবিলা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস মানুষ 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু'–এই একটি স্লোগান উচ্চারণ করেই যুদ্ধ করেছে। এটি ছিল বাঙালির রণধ্বনি বা যুদ্ধ নিনাদ। নেতৃত্বের আসনে রেখে তাঁরই সাহসী চেতনার দ্বারা সাহস সঞ্চয় করে মুক্তিযুদ্ধসহ সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে এদেশের মানুষ। তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি বাংলাদেশের প্রথম সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ঐ নয় মাস নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সংসার-জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর মতোই একপ্রকার কারাবাসের জীবনই ছিল তাঁর। একজন ব্যক্তির দেশপ্রেম, তাঁর দৃঢ়তা, সাহস ও আপোশহীনতা কতটা সুউচ্চ হলে তিনি জনগণের হৃদয়ে এতটা শ্রদ্ধা ও আস্থার আসন অর্জন করতে পারেন, বঙ্গবন্ধু তার এক গৌরবময় ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। সুতরাং বাঙালির যুদ্ধজয় এবং বেঁচে থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে আরেক বিজয়– এই দুয়ের পেছনেই ছিল এদেশের মানুষের গভীর দেশপ্রেম এবং তাদের নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। শুধু দেশের মানুষ নয়, তিনি এর মধ্য দিয়ে অর্জন করেছিলেন বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। বিশ্ব জনমতের চাপেই পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্রের পক্ষে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনি একই কারণে তাঁকে তারা মুক্তি দিতেও বাধ্য হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হিসেবে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন আর সেখান থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরলেন জাতির পিতা হিসেবে। দেশকে, দেশের মানুষকে একাগ্রচিত্তে ভালোবেসে, দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের সাহসিকতা ও অনতিক্রমণীয় নেতৃত্ব দিয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা। মানুষের ভালোবাসা ও স্বাধীনতার আবেগকে ধারণ করেই তিনি অর্জন করেছিলেন এই শক্তি ও সাহস। আর এই অর্জনের পেছনে ছিল নিঃস্বার্থ ত্যাগের মহিমা। বিপুল ত্যাগ স্বীকার ছাড়া বড়ো কিছু অর্জন করা যায় না। নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হলে বিনিময়ে মানুষের গভীর ভালোবাসা পাওয়া যায়। চিত্তকে ভয়শূন্য রেখে শিরকে উচ্চ মহিমায় দৃঢ় রাখতে তিনি পেরেছিলেন এভাবেই। আজও দেশকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে, বড়ো কিছু অর্জন করতে হলে এরূপ ত্যাগ স্বীকারের বিকল্প নেই, গভীর দেশপ্রেমের বিকল্প নেই, বিকল্প নেই নীতিপরায়ণতার।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে *ইত্তেফাক* ও অধুনালপ্ত *দৈনিক বাংলা*'র ২৭শে জুলাই ১৯৭৫ তারিখের সংখ্যায় নিম্নোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়:

> জাতির জনক রাষ্ট্রপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক 'ডক্টর অব ল'জ' ভূষিত করার প্রস্তাব করে। বঙ্গবন্ধু এ সম্মান গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কারণ, চ্যান্সেলর হিসেবে এ ডিগ্রি গ্রহণ করা অনুচিত হবে বলে তিনি মনে করেন। বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য সহানুভূতি ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। শনিবার (২৬শে জুলাই ১৯৭৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জীবনে এমন অনেক অনন্য দৃষ্টান্ত আছে। বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই এটা যেমন বাস্তবতা, আবার বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝেই আছেন এটিও একইভাবে সত্য, কারণ বঙ্গবন্ধু রচিত গ্রন্থত্রয়: *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* ও *আমার দেখা নয়াচীন* ছাড়াও জীবদ্দশায় বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত অসংখ্য বক্তৃতা, বিবৃতি, বাণী, নির্দেশ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সর্বদাই ইতিহাসে অনপনেয় হয়ে থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন প্রজন্ম ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করবে– এই প্রত্যাশা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল বাঙালির।

---

*লেখক: অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগ এবং সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু

প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উচ্চশিক্ষায় আকৃষ্ট করা এবং বাংলায় ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে পরিকল্পিত এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বহু গুণী মানুষের সান্নিধ্যে ধন্য হয়ে ওঠে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠতম বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অম্ল-মধুর সম্পর্কের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন বঙ্গবন্ধু, এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন বঙ্গবন্ধু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলন সমর্থন করার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন বঙ্গবন্ধু, পরবর্তীতে এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কয়েক ঘণ্টা আগে ১৯৭৫ সালের মধ্য আগস্টে সপরিবারে শহিদ হন বঙ্গবন্ধু।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, একটি মহান প্রতিষ্ঠান আর একজন মহান মানুষ, উভয়ই প্রায় সমান বয়সি। শতবর্ষ পূর্বে প্রায় কাছাকাছি সময়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান আর ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের মিশন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪১ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে আই.এ ক্লাসে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে আই.এ পাস করে এখানেই ভর্তি হন স্নাতক শ্রেণিতে। ১৯৪৭ সালে ইসলামিয়া কলেজ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সেপ্টেম্বর মাসে বেকার হোস্টেলের আবাস ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। অতঃপর ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের নতুন রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। এ পর্বে প্রধানত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রথমত. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় শিক্ষার্থীদের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয়ত. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংগঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমবেত করা এবং নেতৃত্ব প্রদান এবং তৃতীয়ত. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন সমর্থন করা।

নঈমুদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক করে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে গঠিত ছাত্রলীগের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ছিল খুবই নিবিড়। বস্তুত, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই ছাত্র সংগঠন সৃষ্টিতে শেখ মুজিবুর রহমানই পালন করেন মুখ্য ভূমিকা। তাঁর একক চিন্তা ও উদ্যোগের ফলেই গঠিত হয়েছে এই ছাত্র সংগঠন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা আবদুল মতিন উপস্থাপন করেছেন এভাবে : '১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো। এর মাস চারেক পর একদিন শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের ফজলুল হক হলে আসেন। তিনি এক ছাত্রসমাবেশে বক্তৃতা দেন। আমিও শ্রোতা হিসেবে ওই ছাত্রসভায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ করে বলেন, 'আমরা পাকিস্তান পেয়েছি। একে উন্নত করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এজন্য দরকার একটি শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন। চলুন, আমরা শাহ আজিজুর রহমানের কাছে যাই এবং নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে নতুন করে শক্তিশালী করার জন্য তাকে বলি।' শেখ মুজিবুর রহমানসহ আমরা বেশ কয়েকজন ছাত্র শাহ আজিজুর রহমানের কাছে গেলাম। শাহ আজিজুর রহমান তখন 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান শাহ আজিজুর রহমানকে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিল সভা ডাকার জন্য অনুরোধ করেন। শাহ আজিজুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাব অনুযায়ী কাউন্সিল সভা ডাকতে রাজি হলেন না। শাহ আজিজুর রহমান নাজিমুদ্দীন সরকারের সমর্থক। কাউন্সিল সভা আহ্বান করা হলে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে তাঁর নেতৃত্ব বহাল থাকবে না, তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের লক্ষ করে বললেন, 'আপনারা এগিয়ে আসুন, আমরা একটি নতুন ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলি।' আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলাম। মোগলটুলি ওয়ার্কার্স ক্যাম্প সমর্থিত নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা শেখ মুজিবুর রহমানের আবেদনে সাড়া দিলেন। অলি আহাদ, নঈমুদ্দিন আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, মোহাম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমিসহ আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ছাত্র ফজলুল হক হল মিলনায়তনে এক কর্মীসভায় বসি। এ সভায় আমরা 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠন করি। অলি আহাদ ও মোহাম্মদ তোয়াহা সংগঠনের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেওয়ার জন্য সভায় দাবি জানান। এই দাবির বিরোধিতা করে শেখ মুজিবুর

রহমান বললেন, 'এ সময় এটা বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। সরকার ভুল ব্যাখ্যা দেবে। পরে সময় হলে তা বাদ দেওয়া যাবে।' আমি শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানালাম। 'মুসলিম' শব্দ রাখা হলো। অলি আহাদ তা মেনে নিলেন। মোহাম্মদ তোয়াহা তা মানলেন না। তিনি এই সংগঠনের সঙ্গে তাঁর আর কোনো সম্পর্ক রাখলেন না। আমরা নঈমুদ্দিন আহমদকে এই নতুন ছাত্র সংগঠনের আহ্বায়ক নির্বাচন করি। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।'

শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তা ও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ১৯৪৭-১৯৫২ কালপর্বে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সফল করার জন্য শেখ মুজিবই সংগঠনের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠন সৃষ্টি করলেও এর মূল কোনো পদে নিজেকে রাখেননি। নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রথম সাংগঠনিক কমিটির অন্যতম সদস্য। নঈমুদ্দিন আহমদ আহ্বায়ক থাকলেও সংগঠনের মূল দায়িত্ব পালন করতেন শেখ মুজিবুর রহমান। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে তিনি লিখেছেন– 'যদিও নঈমুদ্দিন কনভেনর ছিল, কিন্তু সকল কিছুই প্রায় আমাকেই করতে হত।' অতএব, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংগঠনে যে ভূমিকা পালন করেছে, সংগঠনের মূল চালকশক্তি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান যে তার অংশী, তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় এম. আর. আখতার মুকুলের ভাষ্য: '১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন সংগ্রামী ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ক্লাসে ভর্তি হন। এ সময় তিনি অনুভব করেন যে, অচিরেই মুসলিম লীগের ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এসব ইস্যুর অন্যতম হবে বাংলা ভাষার আন্দোলন। এজন্যই শেখ মুজিব স্বয়ং উদ্যোগ গ্রহণ করে ... পৃথক ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করলেন।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থাকাকালে শেখ মুজিবুর রহমানের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। ছাত্রলীগের নানা অনুষ্ঠান বা সাংগঠনিক আলোচনাসভায় তিনিই পালন করতেন মুখ্য ভূমিকা। সাংগঠনিক কাজে এক হল থেকে অন্য হলে তিনি যাতায়াত করতেন– কলা ভবনের নানা কাজে অংশগ্রহণ করতেন। এভাবে বিবেচনা করলে বলা যায়, ১৯৪৮-১৯৪৯ কালপর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রলীগ সংগঠনসূত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পর্কের একটা প্রধান অনুষঙ্গ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। এ সূত্রে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও তমদ্দুন মজলিসের যৌথ উদ্যোগে ফজলুল হক মুসলিম হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি বর্ধিত সভা আহ্বান করা হয়। এই সভা আহ্বানে শেখ মুজিবুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী কামরুদ্দীন আহমদ। এই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– আবুল কাশেম, রনেশ দাশগুপ্ত, আজিজ আহমদ, সরদার ফজলুল করিম, অজিত গুহ, শামসুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, নঈমুদ্দিন আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, তোফাজ্জল আলী, মোহাম্মদ তোয়াহা, আলী আহমেদ, মহিউদ্দীন, আনোয়ারা খাতুন, শামসুল আলম, শহীদুল্লা কায়সার, শওকত আলী, তাজউদ্দীন আহমদ, লিলি খান, আবদুল আউয়াল, ওয়াহেদ চৌধুরী, নূরুল আলম, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ। উল্লেখ্য, এদের অধিকাংশই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এই সভায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' পুনর্গঠিত হয়। এটিকেই বলা হয় 'দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' বা 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন শামসুল আলম। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, তমদ্দুন মজলিস, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রাবাস থেকে দুজন করে প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনে তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে মযহারুল ইসলাম লিখেছেন : 'এই সংগ্রাম পরিষদ গঠনে শেখ মুজিব বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন এবং তাঁর ভূমিকা ছিল যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুদূরপ্রসারী।'

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ২রা মার্চের সভাতেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এবং পাকিস্তান গণপরিষদে সরকারি ভাষার তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংগঠনিক সফরে বেরিয়ে পড়েন, উদ্দেশ্য জেলায় জেলায় ১১ই মার্চের কর্মসূচি পালনের ব্যবস্থা করা। শেখ মুজিবুর রহমান এ উদ্দেশ্যে ফরিদপুর, যশোর, খুলনা ও বরিশাল সফর করেন। সর্বত্রই ছাত্রসভা করে ১১ই মার্চের কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানান। ১১ই মার্চের ধর্মঘট সম্পর্কে বিস্তারিত কর্মসূচি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০ই মার্চ রাতে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি সভা বসে। এ সভা সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে লেখেন : 'রাতে কাজ ভাগ হলো– কে কোথায় থাকব এবং কে কোথায় পিকেটিং করার ভার নেব।' ১১ই মার্চের ধর্মঘটের জন্য ছাত্ররা ব্যাপক প্রস্তুতি চালায়– কে কোন স্থানে পিকেটিং-এ নেতৃত্ব দেবে, তাও ঠিক করা হয়। পিকেটিং চলাকালে নেতৃস্থানীয় কেউ গ্রেপ্তার হলে তার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে, তাও ঠিক করা হয়। এইসব কর্মসূচি প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১১ই মার্চ সেক্রেটারিয়েটের গেটে পিকেটিং করার সময় পুলিশ শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের চুক্তির মাধ্যমে ১৫ই মার্চ সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে চলে আসেন। ১৬ই মার্চ দুপুর একটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের বিশাল সমাবেশ হয়। সেই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার ছাত্র জমায়েতে শেখ মুজিবুর রহমানের এটাই প্রথম সভাপতিত্ব করা। এ সম্পর্কে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন : '১৬ তারিখ সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রসভায় আমরা সকলেই যোগদান করলাম। হঠাৎ কে যেন আমার নাম প্রস্তাব করে বসল সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য। সকলেই সমর্থন করল। বিখ্যাত আমতলায় এই আমার প্রথম সভাপতিত্ব করতে হলো। অনেকেই বক্তৃতা করল। সংগ্রাম পরিষদের সাথে যেসব শর্তের ভিত্তিতে আপোশ হয়েছে তার সকলগুলিই সভায় অনুমোদন করা হলো। তবে সভা খাজা নাজিমুদ্দীন যে পুলিশি জুলুমের তদন্ত করবেন, তা গ্রহণ করল না; কারণ খাজা সাহেব নিজেই প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমি বক্তৃতায় বললাম, 'যা সংগ্রাম পরিষদ গ্রহণ করেছে, আমাদেরও তা গ্রহণ করা উচিত। শুধু আমরা ঐ সরকারি প্রস্তাবটা পরিবর্তন করতে অনুরোধ করতে পারি, এর বেশি কিছু না।' ছাত্ররা দাবি করল, শোভাযাত্রা করে আইন পরিষদের কাছে গিয়ে খাজা সাহেবের কাছে এই দাবিটা পেশ করবে এবং চলে আসবে। আমি বক্তৃতায় বললাম, তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েই আপনারা আইনসভার এরিয়া [বর্তমান জগন্নাথ হল] ছেড়ে চলে আসবেন। কেউ সেখানে থাকতে পারবেন না। কারণ সংগ্রাম পরিষদ বলে দিয়েছে, আমাদের আন্দোলন বন্ধ করতে কিছুদিনের জন্য। সকলেই রাজি হলেন।' এই পর্বে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর এই ভাষ্য : 'শুধু তাই নয়, ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ থেকে ভাষা আন্দোলনের ছাত্রনেতাদের মুক্তি লাভের পর আন্দোলনের নেতৃত্ব মুখ্যত শেখ মুজিবের হাতেই আবার চলে আসে।'

পরিষদ ভবনে খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে দাবি উত্থাপন সূত্রে বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। উপায়ন্তর না দেখে মুখ্যমন্ত্রী সেনাবাহিনী তলব করেন। সেনাসদস্যরা ছাত্রদের উপর নির্মম নির্যাতন চালায় এবং পরিষদ ভবনের পেছনের দরজা দিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীনকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন : 'এক শোভাযাত্রা করে আমরা হাজির হয়ে কাগজটা ভিতরে পাঠিয়ে দিলাম খাজা সাহেবের কাছে। আমি আবার বক্তৃতা করে সকলকে চলে যেতে বললাম এবং নিজেও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে চলে আসবার জন্য রওয়ানা করলাম। কিছু দূর এসে দেখি, অনেক ছাত্র চলে গেছে। কিছু ছাত্র ও জনসাধারণ তখনও দাঁড়িয়ে আছে আর মাঝে মাঝে স্লোগান দিচ্ছে। আবার ফিরে গিয়ে বক্তৃতা করলাম। এবার অনেক ছাত্রও চলে গেল। আমি হলে চলে আসলাম। প্রায় চারটায় খবর পেলাম; আবার বহু লোক জমা হয়েছে, তারা বেশিরভাগ সরকারি কর্মচারী ও জনসাধারণ, ছাত্র মাত্র কয়েকজন ছিল। শামসুল হক সাহেব চেষ্টা করছেন লোকদের ফেরাতে। মাঝে মাঝে হলের ছাত্ররা দু'একজন এমএলএ'কে ধরে আনতে শুরু করেছে মুসলিম হলে। তাদের কাছ থেকে লিখিয়ে নিচ্ছে, যদি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে না পারেন, তবে পদত্যাগ করবেন। ... আমি ছুটলাম এ্যাসেম্বলির দিকে। ঠিক কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেছি তখন লাঠিচার্জ ও কাঁদানো গ্যাস ব্যবহার করতে শুরু করেছে পুলিশ। আমার চক্ষু জ্বলতে শুরু করেছে। পানি পড়ছে, কিছুই চোখে দেখি না। কয়েকজন ছাত্র ও পাবলিক আহত হয়েছে। আমাকে কয়েকজন পলাশি ব্যারাকের পুকুরে নিয়ে চোখে-মুখে পানি দিতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পরে একটু আরাম পেলাম। দেখি মুসলিম হলে হৈ চৈ। বাগেরহাটের ডা. মোজাম্মেল হক সাহেবকে ধরে নিয়ে এসেছে। তিনি এমএলএ। তাঁকে ছাত্ররা জোর করছে লিখতে যে, তিনি পদত্যাগ করবেন। আমাকে তিনি চিনতেন, আমিও তাঁকে চিনতাম। আমি ছাত্রদের অনুরোধ করলাম, তাঁকে ছেড়ে দিতে। তিনি লোক ভালো এবং শহীদ সাহেবের সমর্থক ছিলেন। অনেক কষ্টে, অনেক বুঝিয়ে তাঁকে মুক্ত করে বাইরে নিয়ে এলাম। একটা রিকশা ভাড়া করে তাঁকে উঠিয়ে দিলাম। হঠাৎ খবর এল, শওকত মিয়া আহত হয়ে হাসপাতালে আছে। তাড়াতাড়ি ছুটলাম তাকে

প্রকাশিত কিন্তু অপ্রচারিত
ক্রোড়পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলারের
শুভাগমন উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

আমাদের এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অপঠিত মানপত্র

দেখতে। সত্যই সে হাতে, পিঠে আঘাত পেয়েছে। পুলিশ লাঠি দিয়ে তাকে মেরেছে। আরও কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছে। সকলকে বলে আসলাম, একটু ভালো হলেই হাসপাতাল ত্যাগ করতে। কারণ, পুলিশ আবার গ্রেফতার করতে পারে।'

১৯৪৮ সালের ১৬ই মার্চ পরিষদ ভবনের সামনে কর্মসূচি পালনকালে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর নির্যাতনের প্রতিবাদে ওই দিন রাতে ফজলুল হক মুসলিম হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ এক সভায় মিলিত হন। সভায় শেখ মুজিবুর রহমান যোগদান করেন। পরিষদ ভবনের সামনে প্রতিবাদ সভায় অংশগ্রহণ, পুলিশের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সভায় বাগবিতণ্ডা হয় এবং একে অপরকে দোষ দিতে থাকে। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান উভয় পক্ষকে শান্ত করান। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আসন্ন ঢাকা সফরের কারণে সংগ্রাম পরিষদ কঠোর কোনো কর্মসূচি না দিয়ে ১৭ই মার্চ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুধু প্রতিবাদ ধর্মঘটের ডাক দেয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ১৭ই মার্চ পূর্ববঙ্গের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। এইদিন বেলা সাড়ে বারোটায় বটতলায় এক প্রতিবাদী ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র অংশগ্রহণ করে। প্রতিবাদী ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ। আন্দোলনের সামগ্রিক পরিস্থিতি, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আসন্ন ঢাকা সফর, ভবিষ্যৎ করণীয়– এসব বিষয় বক্তৃতা করেন শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুর রহমান চৌধুরী, অলি আহাদ প্রমুখ। সভায় বক্তারা পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর জুলুমকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। ছাত্র ফেডারেশনের কয়েকজন কর্মী রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে প্রতিনিধিত্ব দাবি করে বক্তব্য রাখলে সভায় হট্টগোল দেখা দেয়। এ সময় সবপক্ষকে শান্ত করতে শেখ মুজিবুর রহমান মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফরের আগে সবপক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান তিনি। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতি ছাত্র নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসে তখনো চিড় ধরেনি। তারা ধারণা করেছিলেন ঢাকা এসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা সমস্যার একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান দেবেন।

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের ঢাকা সফর উপলক্ষে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সমুদয় কর্মসূচি ১৭ই মার্চ অপরাহ্ন থেকে স্থগিত করা হয়। ওই দিন রাত ন'টায় ফজলুল হক মুসলিম হলের হাউস টিউটরের কক্ষে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় উপস্থিত থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তী কর্মসূচি সম্পর্কে সকলকে ধারণা দেন। ১৯৪৮ সালের ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক কার্জন হলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিশেষ সমাবর্তন সভায় ভাষণ দেন। সমাবর্তন সভায় জিন্নাহ বলেন: 'There can be only one state language, if the component parts of this state are to march forward in unison and that language, in my opinion, can only be Urdu'. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই কথা শুনে সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা তাৎক্ষণিক এর প্রতিবাদ করে। তারা 'নো নো' বলে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানায়। কার্জন হলে সমাবর্তন হলের ভেতরে সেদিন ছিলেন না শেখ মুজিবুর রহমান, কেননা তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট নন। তিনি সংগঠনের কর্মীদের নিয়ে হলের বাইরে অবস্থান করেছিলেন। যখন জিন্নাহর বক্তৃতার বিষয়ে জানতে পারলেন, তখন কর্মীদের নিয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে স্লোগান দিতে থাকেন শেখ মুজিব। হল থেকে জিন্নাহ যখন বেরিয়ে যান, তখনো শেখ মুজিবুর রহমান শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ উচ্চারণ করেন এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাতে থাকেন। জিন্নাহর পক্ষে এবং বিপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৯৪৮ সালের ২রা এপ্রিল অপরাহ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে কতিপয় ছাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষে বক্তৃতা দেয়। এ সংবাদ অবগত হয়েই শেখ মুজিবুর রহমান ফজলুল হক মুসলিম হলে গিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানান। এ প্রসঙ্গে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে শেখ মুজিবুর রহমান লেখেন: 'জিন্নাহ যা বলবেন তাই আমাদের মানতে হবে। তিনি যখন উর্দুই রাষ্ট্রভাষা বলেছেন তখন উর্দুই হবে।' আমি তার প্রতিবাদ করে বক্তৃতা করেছিলাম, আজও আমার এই কথাটা মনে আছে। আমি বলেছিলাম, 'কোনো নেতা যদি অন্যায় কাজ করতে বলেন, তার প্রতিবাদ করা এবং তাকে বুঝিয়ে বলার অধিকার জনগণের আছে।' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতি অনুরাগ থাকলেও তার অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী বক্তব্য কিছুতেই মেনে নেননি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বরং এ সূত্রেই রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে ক্রমে অনুপ্রবিষ্ট হলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণসহ নানা কারণে সরকার পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন আরম্ভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় অনেক ছাত্রকে কারাবন্দি করা হয়, অনেককে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হয়। সরকারি দমন-পীড়নের প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে গঠিত হয় 'জুলুম প্রতিরোধ কমিটি'। শেখ মুজিবুর রহমানকে করা হয় এই কমিটির আহ্বায়ক। ১৯৪৯ সালের ৮ই জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিনের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস'-এর এই সভায় সংগঠনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, দবিরুল ইসলাম, নাদের বেগম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এ প্রসঙ্গে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন : 'ছাত্ররা আমাকে কনভেনর করে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালন করার জন্য একটা কমিটি করেছিল। একটা দিবসও ঘোষণা করা হয়েছিল। ... এই প্রথম পাকিস্তানের রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির আন্দোলন এবং জুলুমের প্রতিবাদ। এর পূর্বে আর কেউ সাহস পায় নাই। তখনকার দিনে আমরা কোনো সভা বা শোভাযাত্রা করতে গেলে একদল গুন্ডা ভাড়া করে আমাদের মারপিট করা হত সভা ভাঙার চেষ্টা করা হত। 'জুলুম প্রতিরোধ দিবসে' বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়ও কিছু গুন্ডা আমদানি করা হয়েছিল। আমি খবর পেয়ে রাতেই সভা করি এবং বলে দেই, গুন্ডামির প্রশ্রয় দেয়া হলে এবার বাধা দিতে হবে। আমাদের বিখ্যাত আমতলায় সভা করার কথা ছিল; কর্তৃপক্ষ বাধা দিলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে মাঠে মিটিং করলাম। একদল ভালো কর্মী প্রস্তুত করে বিশ্ববিদ্যালয় গেটে রেখেছিলাম, যদি গুন্ডারা আক্রমণ করে তারা বাধা দিবে এবং তিন দিক থেকে তাদের আক্রমণ করা হবে যাতে জীবনে আর রমনা এলাকায় গুন্ডামি করতে না আসে– এই শিক্ষা দিতে হবে।'

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফর, সেপ্টেম্বর মাসে তার মৃত্যু, দেশজুড়ে খাদ্যসংকট, কর্ডনপ্রথা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং ছাত্রদের ওপর পুলিশি দমন-পীড়নের কারণে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে নিপতিত হয়। এ সময় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সাময়িক স্থবিরতা নেমে আসে। এ কারণে বেশ কিছুদিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কোনো কর্মসূচি এ সময় ছিল না। তবুও এর মাঝেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্ভাব্য সবকিছু করতে থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী সব সময় লেগেই থাকত। তা সত্ত্বেও ১৯৪৯ সালের ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে আন্দোলনে কিছুটা গতি আসে। ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নবাবপুর রোডে মিছিল হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হয় ছাত্রসভা। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনীর রিপোর্টে পাওয়া যায় এই তথ্য: 'While passing through Sadarghat we found a procession of about 200 students led by Sk. Mujibur Rahman, Dabirul Islam and Kalyan Das Gupta proceeding along Nowabpur Road shouting slogans such as 'Pakistan Zindabad', 'Police Zulum Chalbe na', 'Vice Chancellor -এর বিশ্বাসঘাতকতা চলবে না।' We followed them upto F.H. Hall at 12.00. They entered the Hall. We then went to the University to attend a meeting to be held there.' ১৯৪৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতিসঞ্চারে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঝিমিয়ে পড়লে ছাত্রলীগের মাধ্যমে তিনি আন্দোলনে গতিসঞ্চারে চেষ্টা করেছেন। ১৯৪৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান বন্দি হন এবং একটানা প্রায় ২৬ মাস তিনি কারাগারে আটক থাকেন। এভাবে দেখা যায়, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সূত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, বিভিন্ন হল এবং প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রজীবন এক বছর তিন মাস স্থায়ী ছিল। আইন বিভাগের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের ক্লাসের ক্রমিক নম্বর ছিল ১৬৬। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সময় প্রথম পর্ব থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি দ্বিতীয় পর্বে ভর্তি হয়েছিলেন। আবাসিক ছাত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকতেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক এবং সম্পর্কসূত্র আপাত ছিন্ন হবার সূত্রে ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনের কথা এসে যায়। ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে স্তব্ধ করার মানসে নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের বন্দি করতে থাকে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ওপর নানামাত্রিক নির্যাতন নেমে আসে, তাদেরকে অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন: '... বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করেছে এবং ছাত্ররা তার সমর্থনে ধর্মঘট করছে। নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীরা বহুদিন পর্যন্ত তাদের দাবি পূরণের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন করেছে এ কথা আমার জানা ছিল। এরা আমার কাছেও এসেছিল। পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেসিডেন্সিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন এটাই পূর্ব বাংলার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কর্মচারীদের সংখ্যা বাড়ে নাই। তাদের সারা দিন ডিউটি করতে হয়। পূর্বে বাসা ছিল, এখন তাদের বাসা প্রায়ই নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কারণ নতুন রাজধানী হয়েছে, ঘরবাড়ির অভাব। এরা পোশাক পেত, পাকিস্তান হওয়ার পরে কাউকেও পোশাক দেওয়া হয় নাই। চাউলের দাম ও অন্যান্য জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। চাকরির কোনো নিশ্চয়তাও ছিল না। ইচ্ছামতো তাড়িয়ে দিত, ইচ্ছামতো চাকরি দিত। ... এরা ধর্মঘট করেছে ... কর্তৃপক্ষ এদের দাবি মানতে অস্বীকার করেছে। ... বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেবেন ঠিক করেছে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনের সামগ্রিক এই প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমান উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কোনো সংগঠন ছাড়াই ধর্মঘটের মতো বড়ো আন্দোলনে যাওয়া উচিত হয়নি বলে তিনি কর্মচারীদের জানিয়ে দেন। তবে তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখতে উদ্যোগী হন। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাতে কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া মেনে নেন সেজন্যও সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। প্রথমে তিনি একা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে দেখা করেন–কর্মচারীদের দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। পরে

ফজলুল হক মুসলিম হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপিদ্বয় এবং কয়েকজন ছাত্রনেতাকে নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে লিখেছেন: 'বিকেলে আবার ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপিদের নিয়ে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে [উপাচার্য] অনুরোধ করলাম, এই কথা বলে যে, 'আপনি আশ্বাস দেন, ওদের ন্যায্য দাবি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করে দিতে চেষ্টা করবেন এবং কাউকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করবেন না এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কারও বিরুদ্ধে গ্রহণ করবেন না।' অনেক আলোচনা হয়েছিল, পরের দিন তিনি রাজি হলেন। আমাদের বললেন, 'আগামীকাল ধর্মঘট প্রত্যাহার করে চাকরিতে যোগদান করলে কাউকে কিছু বলা হবে না এবং আমি কর্তৃপক্ষের কাছে ওদের ন্যায্য দাবি মানাতে চেষ্টা করবো।' কিন্তু অল্প সময়ের নির্দেশের কারণে পরদিন সকালে অনেকেই কর্মস্থলে উপস্থিত হতে পারেনি। সকাল ১১টার মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের চাকরিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলো, বাকিদের করা হলো বরখাস্ত'। এ পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পক্ষে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। এ অবস্থায় কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বিভিন্ন ছাত্রের ওপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করেন। ছয়জন ছাত্রকে চার বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়, পনেরো জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয় ছাত্রাবাস থেকে, শেখ মুজিবসহ পাঁচজনকে ১৫ টাকা এবং একজনকে এক টাকা জরিমানা করা হয়। প্রথমোক্ত একুশ জনের মধ্যে অনেকে গোপনে বন্ড দিয়ে ছাত্রত্ব অক্ষুণ্ন রাখে; যাদের অর্থদণ্ড করা হয়, তাদের অনেকেই অর্থ জমা দিয়ে শাস্তি থেকে মুক্ত হলেন। কিন্তু আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান বন্ড সই করে চলার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং পনেরো টাকা জরিমানাও দিলেন না। ফলে ১৯৪৯ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে। অন্যায়ের কাছে আপোশ করা স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল বলে, পরবর্তীকালে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান আর কখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান এবং এ কারণে বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার হওয়া প্রসঙ্গে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়। শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন : 'এ সময় ড. ওসমান গনি সাহেব সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ছিলেন। তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায় আমাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করলেন। তাঁকে সমর্থন করলেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, কিন্তু কমিটির অন্যান্য সদস্য রাজি হলেন না। ... ১৮ তারিখে ছাত্র শোভাযাত্রা করে ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়িতে গেলাম এবং ঘোষণা করলাম, 'আমরা এখানেই থাকবো, যে পর্যন্ত শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার না করা হয়।' একশজন করে ছাত্র রাতদিন ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়িতে বসে থাকবে। তাঁর বাড়ির নিচের ঘরগুলিও দখল করে নেওয়া হলো। একদল যায়, আর একদল থাকে। ১৮ তারিখ রাত কেটে গেল, শুধু আমি জায়গা ত্যাগ করতে পারছিলাম না। কারণ শুনলাম, তিনি পুলিশ ডাকবেন। ১৯ তারিখ বিকাল তিনটায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এসপি বিরাট একদল পুলিশবাহিনী নিয়ে হাজির হলেন। আমি তাড়াতাড়ি সভা ডেকে একটা সংগ্রাম পরিষদ করতে বলে দিলাম। সকলের মতো আমাকেও দরকার হলে গ্রেফতার হতে হবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পাঁচ মিনিট সময় দিলেন আমাদের স্থান ত্যাগ করে যেতে। আমি আটজন ছাত্রকে বললাম, তোমরা এই আটজন থাক, আর সকলেই চলে যাও। আমি ও এই আটজন স্থান ত্যাগ করবো না। ছাত্র প্রতিনিধিদের ধারণা, আমি গ্রেফতার হলে আন্দোলন চলবে, কারণ আন্দোলন ঝিমিয়ে আসছিল। একে চাঙ্গা করতে হলে, আমার গ্রেফতার হওয়া দরকার। আমি তাদের কথা মেনে নিলাম। পাঁচ মিনিট পরে এসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের গ্রেফতারের হুকুম দিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ (এখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক) আটকা পড়েছে। তাকে নিষেধ করা হয়েছে গ্রেফতার না হতে। তাজউদ্দীন বুদ্ধিমানের মতো কাজ করল। বলে দিল, 'আমি প্রেস রিপোর্টার'। একটা কাগজ বের করে কে কে গ্রেফতার হলো, তাদের নাম লিখতে শুরু করল। আমি তাকে চোখ টিপ মারলাম। আমাদের গাড়িতে তুলে একদম জেলগেটে নিয়ে আসল'।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর সামগ্রিক পরিস্থিতি পুরোপুরি পালটে গেল। এবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতা, কখনো প্রধানমন্ত্রী, কখনো রাষ্ট্রপতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও সুযোগ পেল পূর্বসূরির অন্যায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের। সিদ্ধান্তের প্রায় ২৪ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ১৯৭২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাঁকে আজীবন সদস্যপদ প্রদান করেন। যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বহিষ্কার করে, উত্তরকালে সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই আচার্য হয়েছিলেন তিনি। এ এক অবিস্মরণীয় অনুষঙ্গ। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে উপস্থিত হবার কথা ছিল বঙ্গবন্ধুর। কিন্তু তাঁর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে ঘাতকচক্র তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বৃহত্তর রাজনীতিতে তাঁর যাত্রা শুরু, সেখান থেকেই তিনি নতুন বিপ্লবের ডাক দিতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনার যে নতুন রূপরেখা প্রস্তুত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু, তার সূত্রপাত তিনি করতে চেয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকেই। সে সূত্রে জীবনে এবং মরণে বঙ্গবন্ধু মিশে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গভীরভাবে। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য তৎকালীন ছাত্রনেতা মাহবুব জামানের এই স্মৃতিচারণ : 'বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ১৪ আগস্ট রাতে। পরের দিন সকালে উনার (বঙ্গবন্ধু) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা। তাই সর্বশেষ প্রস্তুতির খবর জানাতে আমি ও আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার (প্রফেসর আবদুল মতিন চৌধুরী) গিয়েছিলাম গণভবনে।... আমরা যাওয়ার পরই বঙ্গবন্ধু বললেন, 'সব রেডি তো? আমি কিন্তু অনেক দিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই দ্বিতীয় বিপ্লবের আসল কাজ শুরু হবে। কাল থেকেই নতুন দিন শুরু হবে।'

বঙ্গবন্ধু যাতে এই নতুন দিন শুরু করতে না পারেন, সেজন্য দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা ১৫ই আগস্টের প্রথম লগ্নে তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকীর এই শুভলগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর সম্পর্কের কথা আমাদের মনে পড়ে এবং এই সম্পর্ক সূত্রেই আমরা হয়ে উঠি সন্দীপিত– সুষম বণ্টনভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মানবিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে হয়ে উঠি প্রাণিত।

---

*লেখক: উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়*

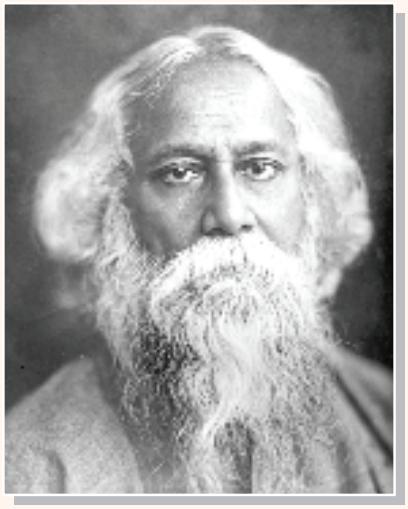

# রবীন্দ্রনাথ ও জাপান

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

রবীন্দ্রনাথ মোট ছয়বার জাপান সফর করেন এবং সেখানে সর্বমোট পাঁচ মাস ১৪ দিন অবস্থান করেন। ১৯১৬ সালে প্রথমবার তিন মাস ছয় দিন, ১৯২৪ সালে চতুর্থবারে ২৩ দিন এবং ১৯২৯ সালে ষষ্ঠবারে ২৯ দিন অবস্থান করেছিলেন। বাকি তিনবারে অবস্থানকাল যাত্রাবিরতি প্রকৃতির– দুই থেকে সাত দিনের মতো।

*জাপান যাত্রীর পত্র* তাঁর প্রথম সফরের সময় সংরচিত। রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য বিদেশ যাত্রার মতো জাপান যাত্রার প্রাক্কালে সেবারও *সবুজ পত্র*'র জন্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। জাপান যাত্রার তিন দিন পর ২১শে বৈশাখ তোসামারু জাহাজে বসেই রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে পত্র লেখেন–

> আমার এ লেখা ধারাবাহিক চিঠিও না প্রবন্ধও না। যা যখন মনে আসছে লিখে যাচ্ছি একবার revise করবার চেষ্টাও করিনি। এরমধ্যে আমাদের যাত্রার ছবি কখন কতখানি পড়বে বলতে পারিনে– কতকগুলি খাপছাড়া প্যারাগ্রাফের মতো হবে। তাতে কি ক্ষতি আছে।
>
> *(চিঠিপত্র ৫,২১৩-১৪, পত্র ৫০)*

১৮ই বৈশাখ, ১৩২৩ (১লা মে, ১৯১৬) খিদিরপুর ডকে তোসামারু জাহাজে চাপার পর থেকে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে) জাহাজ জাপানের কোবে বন্দরে পৌঁছানো পর্যন্ত মোট ২৮ দিনে জাহাজে বসে রবীন্দ্রনাথ ১১টি পরিচ্ছেদ রচনা করেন। ১৬ থেকে ২২শে জ্যৈষ্ঠ কোবে অবস্থানকালে রচনা করেন দুই পরিচ্ছেদ। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ট্রেনে টোকিও রওনা দেন। টোকিও, ইয়াকোহামা এবং ইজিউরাতে সেবার ১৮ই ভাদ্র (৩রা সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত সর্বমোট দুই মাস ২৫ দিন অবস্থান করেন। জাপানে তাঁর প্রথম ভ্রমণকালের এই প্রায় তিন মাস অবস্থানকালে জাপান সম্বন্ধে লেখেন মাত্র দুটি পরিচ্ছেদ। শেষের দুটি পরিচ্ছেদ কখন বা কোথায় বসে লিখেছিলেন তা জানা যায় না। তবে *রবিজীবনী*-তে প্রশান্ত কুমার পাল জানাচ্ছেন–

> এই লেখাগুলিই 'জাপান যাত্রীর পত্র' [বৈশাখ-ভাদ্র, ১৩২৩], 'জাপানের পত্র' [আশ্বিন- কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩২৩] ও 'জাপানের কথা' [ বৈশাখ ১৩২৪] নামে 'সবুজ পত্র'-তে মুদ্রিত হয় এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় *জাপান যাত্রী* [শ্রাবণ ১৩২৬] নামে।
>
> *(রবিজীবনী, আষাঢ় ১৪১৪ সপ্তম খণ্ড, পৃ. ১৭১)*

*জাপান যাত্রী* পরবর্তীকালে ১৩৪৩ সালে জাপানে-পারস্যে গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় *জাপান যাত্রী* জাপান ভ্রমণ সংক্রান্ত বহু তথ্য, চিঠিপত্র , ভাষণ ও অন্যান্য রচনা একত্র করে আলাদাভাবে সচিত্র সংস্করণ হিসেবে প্রকাশিত হয়। *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামে *জাপান যাত্রী* উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথ।

*সবুজ পত্রে* লেখাগুলোর প্রকাশকাল এবং গ্রন্থাকারে *জাপান যাত্রী*'র প্রথম প্রকাশকাল সম্পর্কিত পূর্বোক্ত তথ্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের জাপান যাত্রার লেখা মূলত প্রথমবার যাত্রাপথে জাহাজে বসে লেখা এবং জাপানে বসে লেখা মাত্র চারটি পরিচ্ছেদ, তাও প্রথমবার সফরের সময়।

বাংলা ভূখণ্ডের সাথে জাপানিদের পরিচিতি বেশ কয়েক শত বছর ধরে। বলাবাহুল্য, ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা অংশ সম্পর্কে জাপানিদের আগ্রহ এবং অবগতি তুলনামূলকভাবে বেশি। জাপানে লাল প্রকৃতির একটি বিশেষ রঙের নাম বেঙগারু। 'ল-এর উচ্চারণ' হয়ে থাকে জাপানে। এই রংটির আসল উচ্চারণের নাম বেঙ্গল। জাপানে বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও পালি ভাষার প্রভাব সম্পর্কে পিএইচডি গবেষক প্রফেসর সুয়োৎসু নারা জানিয়েছেন, প্রায় চারশ বছর আগে জাপানি কোনো শিল্পী বাংলা অঞ্চল থেকে এই বিশেষ রংটি জেনে এসেছিলেন এবং জাপানে এর তৈরি এবং ব্যবহার প্রক্রিয়া প্রচলন করেন এবং সে থেকে এ রঙের এ নাম। বাংলার চারু ও কারু শিল্প চর্চার প্রতি জাপানিদের আগ্রহ এবং সম্পর্কের এটি একটি প্রাচীন নির্দেশক।

আধুনিক জাপানের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ চারজনই বাঙালি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫), বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল (১৮৮৬-১৯৬৭) এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে জাপানের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল টোকিও ট্রায়ালে জাপানিদের দোষী সাব্যস্ত করে দেওয়া রায়ে নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে জাপানিদের সমর্থন করেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সাথে জাপানের টেকসই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি বাংলাদেশকে জাপানের মডেলে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, উদীয়মান সূর্যের দেশ জাপানের লাল-সাদা জাতীয় পতাকার আদলে বাংলাদেশের লাল-সবুজ শোভিত জাতীয় পতাকা গ্রহণ করেছিলেন।

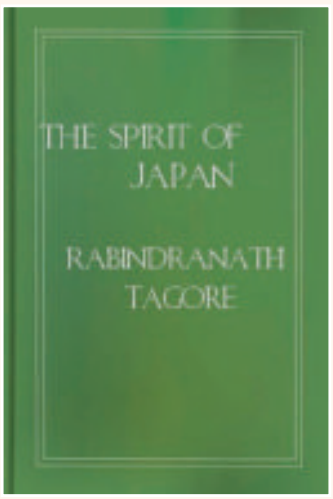

পুরো বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যে এশিয়ার মাত্র তিনজন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথমজন বাঙালি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১) আর বাকি দুজনই জাপানি, ইয়াসুনারী কাওয়াবাতা (১৮৯৯–১৯৭২) এবং কেনজাবুরে ওয়ে (১৯৩৫)। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে, কাওয়াবাতা ১৯৬৮ সালে আর ওয়ে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৯৪ সালে। এশিয়ার তাবৎ ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলা আর জাপানির এই সগৌরব বিশ্ব স্বীকৃতি বাংলাদেশ আর জাপানের জনগণের মধ্যেকার ভাব বন্ধনের একটি উজ্জ্বল উপলক্ষ ও প্রেরণা।

বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অবিসংবাদিত। আমরা জানি, বিংশ শতাব্দীর একবারে শুরু থেকেই জাপানিরা রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মাধ্যমে শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সেতুবন্ধ গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। তেনশিন ওকাকুরা শান্তিনিকেতনে জাপানি শিল্পী শিতোকি হোরিকে অধ্যয়নের জন্য পাঠান ১৯০২ সালে। এই শিতোকি হোরিই হচ্ছেন শান্তিনিকেতনে পড়তে আসা প্রথম বিদেশি ছাত্র। ১৯০১ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে তিনি সংস্কৃত ও পালি ভাষার ছাত্র ছিলেন। এরপর বহু শিল্পী বিনিময় ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীকালে।

জাপানের ইজি উরাতে তেনশিন ওকাকুরা মিউজিয়ামে ১৯৯৮ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ভারতীয়-জাপানি শিল্পীদের পারস্পরিক ও প্রভাব বিষয়ক একটি স্মারক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সেখানে প্রতিনিধি স্থানীয় জাপানি চিত্রশিল্পীদের আঁকা বাংলাদেশের দৃশ্যাবলি ও জীবনযাত্রার ছবি এবং জাপান সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের আঁকা ছবিও প্রদর্শন করা হয়। এ উপলক্ষে উদ্যোক্তারা একটি তথ্যবহুল ও দৃষ্টিনন্দন স্মরণিকা প্রকাশ করেন। তাতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ জাপানকে এশিয়ার সূর্য নামে অভিহিত করেছেন এবং জাপানকে এশিয়ার একটি ভরসার স্থল বলেও প্রত্যাশা করেছেন।

*জাপান যাত্রীর পত্র*'র উল্লেখ মতে, ১৯১৬ সালে প্রথমবার জাপান সফরের সময় ১৩ই জুন তারিখে টোকিওর উয়েনো পার্কের কানেইজি বৌদ্ধ মন্দিরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ওকুমা, শিক্ষামন্ত্রী তাকাদা, কৃষিমন্ত্রী কোনো, টোকিও মহানগরীর মেয়র ওকুদাসহ প্রথম সারির রাজনীতিবিদরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যগণ, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধানরা, শিল্পকলা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষ সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথকে আন্তরিক অভ্যর্থনা ও নাগরিক সংবর্ধনা জানিয়েছিল। মানবতাবাদ, শান্তির সপক্ষে এশীয় ঐক্য প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা, তাঁর কণ্ঠে বাংলা ও ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি এবং স্বরচিত সংগীত শুনে জাপানিরা বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও জাপানিদের সৌন্দর্যবোধ, আধ্যাত্মিকতা, শান্তিপ্রিয়তা, হাতের কাজের নিপুণতা, ঐতিহ্যগত শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, নম্রতা, সংযম, বিনয়, সময়ানুবর্তিতার গুণাবলি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। আবার জাপানের উগ্র জাতীয়তাবাদ, সামরিক মনোভাব, সভ্যতার যান্ত্রিকীকরণ আর চৈনিকদের ওপর জাপানের অমানুষিক অত্যাচারের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ জাপানি বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে খুশি করেনি। রবীন্দ্রনাথের সফরসঙ্গী অ্যান্ড্রুজ লিখেছেন–

> when he spoke out strongly against the militant imperialism which he saw on every side in Japan and set forward in contrast his own ideal picture of the true meeting of East and West, with its vista of world brotherhood, the hint went abroad that such pacifist teaching was a danger in war-time, and that the Indian Poet represented a defeated nation. Therefore, almost as rapidly as the enthusiasm had arisen, it subsided. In the end, he was almost isolated, and the object for which he had come to the Far East remained unfulfilled.

অ্যান্ড্রুজ আরো জানান, এরই অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথ 'The Song of the Defeated' কবিতাটি লেখেন। এটি ইংরেজিতে লিখিত তাঁর অন্যতম মৌলিক কবিতা। একই সময় তিনি 'Thanks giving' নামে আরো একটি মৌলিক কবিতা রচনা করেন। প্রসঙ্গত যে, সেবার জাপানে থাকার সময়ে তিনি *কণিকা*'র অনেকগুলো কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

তাঁর ভাষণের যে সমালোচনা হচ্ছিল তার উত্তরে, জাপান থেকে সেবার বিদায়ের কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ *আশাহি শিম্বুন* পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, তাঁকে ভুল বোঝা হয়েছে। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতাকে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন, এমন সমালোচনা তাঁর বক্তব্যের অতিসরলীকরণ মাত্র। বস্তুবাদী সভ্যতাকে একটি তীক্ষ্ণধার ছুরির সঙ্গে তুলনা করে কবি বলেন-

> If you want to use it, please do so carefully. But do not be so attracted by material civilization as to forget completely your spiritual civilization. In a word, I would like to say: Use a sharp razor, but do not be used by it.
>
> (*Tokyo Ashahi Shimbun*, 2nd Sept, 1916)

কোবেতে নেমে জাপানের বস্তুভারাক্রান্ত রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু সিজুওকা স্টেশনে জাপানি বৌদ্ধদের গন্ধধূপ জ্বেলে অভ্যর্থনা প্রত্যক্ষ করে তাঁর মনে হয়েছিল যে, তিনি জাপানে এসেছেন। তখনই বুঝেছিলেন নতুন ও পুরাতন দুটি ধারাই সেখানে প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি আশা করেন, জাপানিরা পুরোনো জাপানকে ভুলে যাবেন না। নতুন জাপান পাশ্চাত্যের অনুকরণ মাত্র, যা তাকে ধ্বংস করবে। তিনি বিশ্বাস করেন, জাপানি সভ্যতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়সাধন করবে ও গৌরবময় প্রাচ্যসভ্যতার আলো পশ্চিমের কাছে বহন করে নিয়ে যাবে। জাপানি মেয়েদের পোশাক ও জীবনযাত্রা, জাপানিদের অনাবশ্যক চেঁচামেচি করে বলক্ষয় না করার প্রবণতা, জাপানি কবিতার বাক্‌সংযমে হৃদয়ের মিতব্যয়িতার পরিচয় পেয়ে জাপানের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তিনি অনুভব করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'আবেগের বোধ এবং প্রকাশকে খর্ব করে সৌন্দর্যের বোধ এবং প্রকাশকে প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে– এখানে এসে অবধি এই কথাটা আমার মনে হয়েছে।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাপান সফরের সময় মুকুলদে, নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, কালিদাস নাগ প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিত ও চিত্রকরদের সাথে নিয়ে যেতেন। তিনি বিশ্বভারতীর কিছু অধ্যাপক ও কর্মীদেরও নানা সময়ে জাপানে পাঠিয়েছিলেন ঐতিহ্যগত জাপানি বিদ্যায় শিক্ষালাভের জন্য। তাঁর জীবৎকালেই জাপানের অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উৎসাহের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানি শিল্পীদের আঁকা চিত্রকর্মের দারুণ ভক্ত ছিলেন। জাপানি চিত্রশিল্পীদের সাথে তাঁর এবং ঠাকুর পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বিশ শতকের শুরু থেকেই জাপানিরা রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মাধ্যমে বাংলাদেশ-জাপান শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সেতুবন্ধ গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়।

শান্তিনিকেতনে জাপানি শিল্পরীতি ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য নিপ্পন ভবনের প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ও প্রত্যাশার আরেক ফলশ্রুতি। জাপানের প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক সুশো ব্যোদো (১৯০৩-১৯৯৩) বিশ্বভারতীতে উচ্চতর গবেষণায় এসে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জাপানে ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে নিপ্পন ভবন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কবিগুরুর সেই স্বপ্ন ১৯৯১ সালে বাস্তবায়িত হয়। এযাবৎ দুজন জাপানি শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতি-সাহিত্যপথিক ড. হাজিমে নাকামুরা (১৯১২-১৯৯৯) এবং প্রফেসর কাজুও আজুমা (১৯৩১-২০১১) শান্তিনিকেতনের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ১৯২৪ সালে জাপানি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের রচনা অনুবাদ শুরু হয় । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জাপানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ ব্যাপকভাবে শুরু হয়। কয়েক বছর আগে ১২ খণ্ডে *রবীন্দ্র রচনাবলি* জাপানি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

*জাপান মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে রবীন্দ্রনাথ*

জাপানিদের আত্মরক্ষার বিদ্যা জুজুৎসুর প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ প্রসঙ্গে *রবীন্দ্র জীবনকথা*'য় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন– 'কবির ইচ্ছা ছিল বাংলার ছেলে ও বিশেষভাবে বাংলার মেয়েরা এই আত্মরক্ষার বিদ্যাটি আয়ত্ত করে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও অপমান নিত্য ঘটনা। দুর্বৃত্তদের হাত হইতে আত্মরক্ষার এই সহজ অস্ত্রটি বাঙালি আনন্দে গ্রহণ করিবে ইহাই ছিল কবির আশা'। ১৯০৫ সালে জাপানের কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ের জিননোৎসুকে সানো শান্তিনিকেতনে প্রথম জুজুৎসু শিক্ষক হিসেবে আসেন। তিনি তিন বছর জুজুৎসু ও জাপানি ভাষা শেখান শান্তিনিকেতনে। জাপানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সফরের সময় সানো সান রবীন্দ্রনাথের সাথে কোবে, ওসাকা ও টোকিও পর্যন্ত সঙ্গ দিয়েছিলেন। *জাপান যাত্রীর পত্রে* তা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ১৯২৪ সালে মূল বাংলা থেকে *গোরা* উপন্যাস জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন সানো। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে জাপানের আধুনিক জুজুৎসু সংস্থা কোদোকানের পাঁচ দান বেল্টপ্রাপ্ত জুজুৎসু শিক্ষক শিনজো তাকাগাকি শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। তাকাগাকি শান্তিনিকেতনে আসার দুমাস পর রবীন্দ্রনাথ তাকে একটি গান লিখে উপহার দিয়েছিলেন:

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়োনা ম্রিয়মান।
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন জুজুৎসু শুধু আত্মরক্ষার জন্যই নয়, আত্মবিশ্বাস তৈরি করার জন্য এবং মন ও শরীরের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য।

জাপান-বাংলা নৃত্য ও সংগীতচর্চায় সখ্যতা সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী ও সুরে জাপানি প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবেই এসেছে যেমনটি তাঁর গানে পশ্চিমা সুর ও ছন্দ এসে শামিল হয়েছে। ১৯৩৫-১৯৩৭ সালে জাপানের কিওসে ঘরানার সদস্য গেনজিরো মাসু শান্তিনিকেতনের সংগীত ভবনের ছাত্ররূপে ভারতীয় সংগীতের ওপর শিক্ষালাভ করেন। জাপানে ফিরে তিনি এশিয়া লোকসংগীত সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৫ সালে সরোজিনী নাইডুর সুপারিশে জাপানি তরুণী শিজু-এ ইরিএ সংগীত ভবনে ভর্তি হয়েছিলেন। শিজু এ ইরিএ'র স্মৃতিচারণ, 'বিশ্বভারতীতে প্রবেশের কিছুদিন পর কিয়েটোর মহিলাদের অতি প্রিয় গান 'গিওন কিউতা' গাইতে গাইতে আমি গুরুদেবকে জাপানি নৃত্য দেখিয়েছিলাম। তা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে ডেকে এনে তাদের সামনে আমাকে আর এক বার সেই নাচ দেখাতে বাধ্য করলেন।' অধ্যাপক কাজুও আজুমা জানিয়েছেন, জনৈক মাকি জাপানে পশ্চিমা নৃত্যের চর্চা শুরু করেছিলেন। ১৯৩৯-১৯৪১ সালে তিনি বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনের ছাত্র হিসেবে রবীন্দ্র-নৃত্য চর্চা করেন। মাকি রবীন্দ্র-নৃত্য শিক্ষায় খুব দ্রুত দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় তিনি মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। তারপর আজীবন তিনি ভারতেই বসবাস করেন।

ধারণা করা হয়ে থাকে, *জাপান যাত্রীর পত্র*'ই বাংলা ভাষায় জাপান বিষয়ক প্রথম বই। তবে ঢাকা থেকে ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হরিপ্রভা তাকেদা'র *বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা* বাংলা ভাষায় জাপান বিষয়ক আরেকটি প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রন্থ। টোকিও প্রবাসী অধ্যাপক ও কলামলেখক মনজুরুল হক লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির দুর্লভ সংগ্রহের ভাণ্ডার থেকে বইটির মাইক্রোফিল্মের ছাপা কপি উদ্ধার করেন। তাঁর এবং রেডিও জাপানের বাংলা বিভাগের প্রধান কাজুহিরো ওয়াতানাবের ভূমিকা প্রবন্ধ সহকারে ১৯৯৯ সালে ঢাকার সাহিত্য প্রকাশ থেকে বইটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। জানা যায়, ঢাকায় আগত জাপানি ভাগ্যান্বেষী যুবক উয়েমন তাকেদা বাঙালি মেয়ে ঢাকার উদ্ধার আশ্রমের হরিপ্রভা মল্লিককে বিয়ে করেন ১৯০৬ সালে। বিয়ের ছয় বছর পর স্বামীর সাথে হরিপ্রভা জাপান সফর করেন ১৯১২ সালে। হরিপ্রভার জাপান ভ্রমণ এবং চার মাসকাল জাপান বাসের অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত এই *বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা*। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের প্রথমবারের 'জাপান ভ্রমণ' (১৯১৬ সালে) বৃত্তান্ত *জাপান যাত্রীর পত্র* প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে।

---

*লেখক : সরকারের সাবেক সচিব এবং এন বি আর'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান; ১৯৯৪-২০০০ সালে জাপানে বাংলাদেশের সাবেক বাণিজ্য দূত*

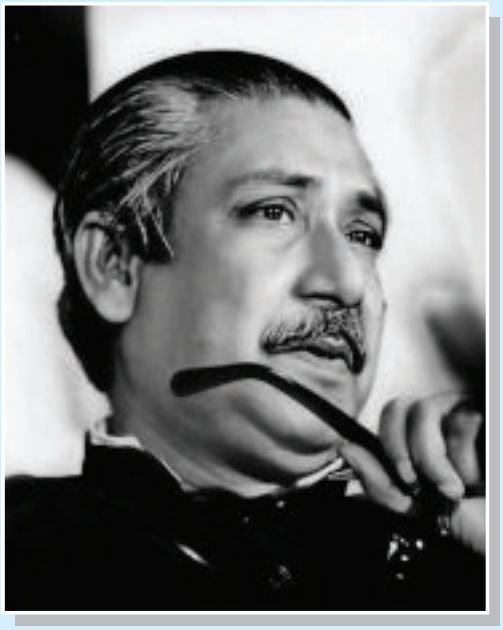

# পনেরোই আগস্ট
# বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বাংলাদেশ বেতার অপারেশন

**খালেক বিন জয়েনউদদীন**

পনেরোই আগস্ট বাঙালি ও বাংলাদেশের কালপঞ্জিতে একটি ঘৃণিত দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে মানব সভ্যতার ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একই দিনে একই সময়ে আরো দুটি বাড়ি– একটি সরকারি স্থাপনা ও মোহাম্মদপুরের বস্তিঘরে আক্রমণ চালিয়ে বঙ্গবন্ধুর আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করা হয়। খুনিদের ছোড়া গোলায় বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়ির উত্তরে সামান্য দূরে নিহত হন শিশুসহ ১৩ জন সাধারণ মানুষ। ঐদিন বঙ্গবন্ধুর খুনিদের তিনটি মূল দলের একটি দলের নরঘাতক মেজর ডালিম মন্ত্রিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর আপন ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতে হত্যাকাণ্ড শেষ করে বাংলাদেশ বেতারের তৎকালীন শাহবাগ কেন্দ্রটি দখল করে কুৎসিত প্রচারণা চালায়।

পনেরোই আগস্ট ঘৃণিত এবং ধিক্কার জানানোর দিন হলেও আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বজনদের আত্মত্যাগের আর্তি জানাই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে। বঙ্গবন্ধুর জঘন্যতম এই হত্যাকাণ্ডে আরো যাঁরা শাহাদতবরণ করেন তাঁরা হলেন– বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন নেছা রেণু, পুত্র শেখ কামাল, পুত্র শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র কিশোর শেখ রিসালউদ্দীন ওরফে রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা, পুত্রবধূ রোজী, বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, সেরনিয়াবাতের পুত্র, কন্যা, নাতি ও ভাইপো যথাক্রমে কিশোরী বেবী, কিশোর আরিফ, সুকান্ত বাবু ও শহীদ। ধানমন্ডির একটি বাড়িতে প্রাণ হারান বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও যুব নেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর স্ত্রী আরজু মণি, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের জ্যেষ্ঠকন্যা এবং বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আক্রান্ত হওয়ার পর উদ্ধার করতে আসা তাঁর সামরিক সচিব বিগ্রেডিয়ার জেনারেল জামিল উদ্দীন আহমেদ। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে অপারেশন করার একই সময়ে খুনি মহিউদ্দীনের গোলায় মোহাম্মদপুরে নিহত হন– রিজিয়া বেগম, শিশু নাসিমা, রাশেদা বেগম, সাবেরা বেগম, আনোয়ারা বেগম, আনোয়ারা বেগম-২, সয়ফুল বিবি, হাবিবুর রহমান, আবদুল্লাহ রফিজল, শাহাবুদ্দীন ও আমিনুদ্দীন। আর বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ও অন্য বাড়িতে নিহত পুলিশ পরিদর্শক সিদ্দিকুর রহমান, তিনজন অতিথি এবং চারজন গৃহকর্মী।

বাংলাদেশ পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে। এদিন আমরা পঁচাত্তরের হৃদয়বিদারক ঘটনায় শোকার্ত হই। প্রিয়জন হারানোর বেদনায় জর্জরিত হই। ভাবতে অবাক হতে হয়, পঁচাত্তরের পরে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত আমরা বঙ্গবন্ধুর নামটি খুনি ফারুক-রশিদ, খোন্দকার-জিয়ার অবৈধ দাপটে উচ্চারণ করতে পারতাম না। সকল প্রচার প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ। বঙ্গবন্ধুকন্যা ১৯৮১-তে দেশে ফিরে এলে নিষিদ্ধের জাল ছিঁড়তে শুরু করে।

পনেরোই আগস্টের ঘটনার পেছনে মদদ জুগিয়েছে একাত্তরের শত্রুপক্ষ, পাকিস্তান এবং এদেশীয় দালাল চক্র। তারা সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাসী কর্নেল-মেজরদের বেছে নেয়। এর মধ্যে একজন বরখাস্তকারী কর্মকর্তাও ছিলেন। এদের মধ্যে প্রধান হোতা ছিল কর্নেল ফারুক এবং তার ভায়রাভাই কর্নেল রশিদ। ইন্ধনদাতা ও প্রত্যক্ষ জড়িত ছিল খোন্দকার ও জিয়া।

পঁচাত্তরের সেই পনেরোই আগস্টে তারা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়ি, মন্ত্রিপাড়ার মিন্টু রোডের আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়ি এবং ধানমন্ডির ১৩ নম্বর সড়কের শেখ ফজলুল হক মণির বাসায় হামলা চালায়। আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় কিলিং মিশন শেষ করে শরিফুল হক ডালিম বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা কেন্দ্র শাহবাগে বিনা বাধায় দখল করে নেয় এবং বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যার কুৎসিত ও নির্মম ঘোষণা দেয়। এখন সেই অপারেশনের ঘটনাগুলো বর্ণনা করছি।

পনেরোই আগস্ট ভোরে ঐসব নরঘাতকদের একটি দল দ্বারা আক্রান্ত হয় শাহবাগে অবস্থিত বেতারের মূল কেন্দ্রটি। তারা অবশ্য গোলাগুলি না ছুড়েই অনায়াসে বেতারে প্রবেশ করে। তখন বেতারে নিরাপত্তা দিত পুলিশের একটি গ্রুপ। তারা থাকত বেতারের পেছনে। পালাক্রমে ফটকে নিয়োজিত থাকত। বেতার আক্রমণকারীদের প্রধান ছিল বরখাস্তকৃত মেজর ডালিম। এই লোকটিই ঘোষণা দেয়– 'রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা, আমি মেজর ডালিম বলছি, স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। সারা দেশে জারি করা হয়েছে কারফিউ ...'। তখন কিন্তু একমাত্র প্রচারমাধ্যম ছিল বেতার। সকালে সেই ঘোষণা ইথারে ছড়িয়ে নরঘাতকেরা ভয়ার্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশে।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়, বিবরণ ও সাক্ষ্য এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নানা রচনায় আমরা আগস্টের প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরেছি। কিন্তু ঐদিন সকালে বাংলাদেশ বেতার অপারেশনে মেজর ডালিম ও কিসমত কীভাবে বেতার ভবনটি দখল করে নেয়, সেই কাহিনি আজো পর্দার আড়ালে থেকে গেছে। পর্দার আড়ালে থেকে গেছে নরঘাতকদের সঙ্গে বেতারের আধিকারিকের যোগসাজশ, দখল দিতে খুনিদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং পরবর্তীকালে তাদের সঙ্গে ওঠাবসা, দালালি করা এবং সনেই সনেই প্রমোশন পাওয়া। কেন

লেখা হয়নি সেই কাহিনি। খুনিদের বেতার দখলের পর বেতার কর্মকর্তা আশরাফুল আলম ও শহিদুল ইসলাম নির্যাতন ভোগ করেন– সেই কাহিনিও।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম– বিনা বাধায় খুনিচক্রের হোতা মেজর ডালিম ও কিসমত ফটকের বাইরে জিপ-ট্রাক রেখে সদর্পে ফটক দিয়ে মূল ভবনে প্রবেশ করে এবং ডিউটি রুমে দাঁড়িয়ে থাকে। সাধারণত অনুষ্ঠান শেষে ডিউটি রুম বন্ধ রাখার নিয়ম। কিন্তু ঐদিন রুমটি খোলা ছিল। দুই-তিন মিনিটের মধ্যে সেখানে ছুটে আসেন বেতারের সহকারী পরিচালক আপেল মাহমুদ। তিনি ডালিম-কিসমতকে নিয়ে তার কক্ষে যান এবং পরিকল্পনা মোতাবেক মুজিব হত্যার ঘোষণা তৈরি করেন এবং বেতার চালু করার জন্য টেকনিশিয়ান ও প্রকৌশলীদের বাসায় ফোন করেন। তারা আপেল মাহমুদের ভয়ে এবং মেজরদের নির্দেশে বেতার ভবনে ছুটে এসে প্রাণ বাঁচান এবং মেজর ডালিম ও আপেল মাহমুদের নির্দেশে তারাও কাঁপতে কাঁপতে স্টুডিও অন করার উপযোগী করে রাখেন। ইতোমধ্যে ওয়্যারলেসে মেজর ডালিম বঙ্গবন্ধু এবং অন্যদের নিধনের সংবাদ অবগত হয়। এরপরই আপেল মাহমুদের মুসাবিদার সেই ঘোষণাটি প্রথম দিকে মেজর ডালিম নিজেই সরাসরি প্রচার করে, পরে তা রেকর্ড করে শোনানো হয় বার বার। বেলা ১০টার দিকে পূর্বের আলোচনা মোতাবেক বেতার ভবনে ছুটে আসেন মুক্তিযুদ্ধের প্রচণ্ড বিরোধিতাকারী খান আতা ওরফে আতাউর রহমান। তিনি আপেল মাহমুদের রুমে বসে নিজের লেখা দুটি গান সুর করেন। গান দুটি আগস্টের তথাকথিত সূর্যসন্তান [কুখ্যাত খুনি] আখ্যায়িত করে ফারুক-রশিদ-ডালিমদের নিয়ে লেখা। একটি গানের চারণ এ রকম– 'ওরা সূর্যসন্তান সূর্যসেনা, ওরা কোনো বাধা মানবে না'। গান দুটি তড়িঘড়ি করে বার বার বাজানো হয়। ইতোমধ্যে বেতারের কিছু কর্মকর্তা আসা শুরু করেছে। কিছু কর্মচারী ও কর্মকর্তা অতি উৎসাহে মেজর ডালিম ও আপেল মাহমুদের নির্দেশ পালনে রত হয়।

ইতোমধ্যে মেজর ডালিমের সঙ্গে আসা সৈন্যরা বেতার ভবনের চতুর্দিকে ঘিরে ফেলে। বেতার ভবনের বাইরে এবং অদূরে দাঁড়িয়ে থাকে মেজর শাহরিয়ারের ট্যাংকবাহিনী। ঢাকার রাস্তায় শুধুই খুনিদের গাড়ির অবাধ চলাচল। সেনানিবাস, বেতার, আগামাসি লেন ও বঙ্গভবনে অবাধ যাতায়াত। এরই মধ্যে ফারুক-রশিদ-খোন্দকার মোশতাককে নিয়ে যায় বঙ্গভবনে। বঙ্গবন্ধু হত্যার অন্যতম নির্দেশদাতা ও পরামর্শক জিয়া ও রশিদ বঙ্গভবনে এসে খোন্দকারকে অভিনন্দন জানায়। চাষী, তাহেরউদ্দীন ঠাকুররাও সেখানে উপস্থিত।

শেখ কামাল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ ফজিলাতুন নেছা

শেখ জামাল

সুলতানা কামাল

শেখ রাসেল

শেখ আবু নাসের

আবদুর রব সেরনিয়াবাত

শেখ ফজলুল হক মণি

পারভীন জামাল রোজী

কর্নেল জামিলউদ্দিন আহমেদ

শহীদ সেরনিয়াবাত

বেবী সেরনিয়াবাত

আরজু মণি

আরিফ সেরনিয়াবাত

সুকান্ত আবদুল্লাহ

আবদুল নঈম খান রিন্টু

সিদ্ধান্ত হয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে খোন্দকার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। জুম্মার নামাজের পর মাথায় পাকিস্তানি টুপি পরে বেতার ভবনে আসে এই ঘৃণিত ব্যক্তিটি। বেতারে তখনো চলছে বঙ্গবন্ধু হত্যার বুলেটিন এবং খুনিদের সূর্যসন্তান আখ্যায়িত করা খান আতার লেখা গান। আপেল মাহমুদের রুমটি তখন মেজর ডালিমের রুমে রূপ নিয়েছে। খানাপিনা ও পানে বিভোর রুমের অবস্থানকারীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেতারে তাশরিফ আনে খোন্দকার মোশতাক। তার সঙ্গে ঠাকুর, চাষী, মোয়াজ্জেমসহ সাঙ্গপাঙ্গরা।

জাতির উদ্দেশে স্বঘোষিত নতুন রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেবে। ভাষণও রেডি। কিন্তু স্টুডিওতে গিয়ে বেঁকে বসল খোন্দকার মোশতাক আহমদ। তিনি মুজিব হত্যার প্রমাণ ছাড়া কথা ও ঘোষণা বিশ্বাস করেন না। বেতার ভবন দখলকারী খুনিরা রীতিমতো অবাক। শেষমেষ মৃত মুজিবের ছবি তোলার জন্য ব্যবস্থা করা হলো। বেলা আড়াইটার দিকে ছবি নিয়ে দ্রুত স্টুডিওতে ঢোকে ডালিম। ছবি দেখে খোন্দকার দাড়ি ও টুপিতে হাত বুলিয়ে ডালিমকে ধন্যবাদ জানায়। অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে ভাষণ শুরু করে এবং বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বলে শেষ করে। এই সময় তিনি আড়ষ্ট ছিলেন। এরপর তিনি দ্রুত খুনিদের প্রহরায় বঙ্গভবনে আশ্রয় নেন।

এরপর বেতার ভবনে চলে আনুগত্যের পালা। বন্দুকের নলের মাথায় ধরে নিয়ে আসে পুলিশ ও বিডিআর প্রধানদের। তারা মোশতাক সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। পনেরোই আগস্ট রাত ১১টা পর্যন্ত চলে খুনিদের যা ইচ্ছে তাই প্রচার। রাত সাড়ে ১১টার পর ভবনের সেই কক্ষটিতে খানাপিনা ও পানে মেতে ওঠে মেজর ও ক্যাপটেনরা। মাঝে দু'তিনবার বেতার ভবন পরিদর্শনে আসে মুজিব হত্যার সিপাহসালার কর্নেল ফারুক।

এরপর বঙ্গভবন হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের অপকর্মের মূল স্থান। ফারুক-রশিদ-খোন্দকারকে পাহারা দিয়ে যে নির্দেশ পাঠাত, তাই প্রচার করত আপেল মাহমুদরা। আমরা বিস্মিত হয়েছি বঙ্গবন্ধু হত্যায় অভিযুক্ত করা হয়নি আপেল মাহমুদ ও খান আতাকে। অথচ বঙ্গবন্ধু পরিষদ থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বঙ্গবন্ধুকন্যা চারবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আর এ সময় বেতারে চাকরি করে মুজিবভক্তরা যে নির্যাতন ভোগ করেছে, তা কি দেশবাসী জানতে পেরেছে?

বাংলাদেশ বেতার একটি রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র। এই যন্ত্রটি দখল করে খুনিরা যত মিথ্যে ভাষণ ও কথা প্রচার করেছে। দেশবাসী বিভ্রান্ত হয়েছে। কিন্তু খুনিদের শেষ রক্ষা হয়নি। ইতোমধ্যে কারো কারো ফাঁসির রজ্জু গলায় পরতে হয়েছে। পনেরোই আগস্ট ফিরে এলে সেই বিভীষিকাময় সময়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে নরঘাতক ফারুক, রশিদ, ডালিম, বজলুল হুদা, মহিউদ্দীন, মোসলেম উদ্দীন প্রমুখের কথা। স্টেনগান দেখিয়ে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত দেশটিকে তারা বঙ্গভবনে আটকে রেখেছিল। আর তাদের নাটের গুরু ছিল খোন্দকার। পর্দার আড়ালে ছিল তাদের মদদদাতা জিয়া। ৭ই নভেম্বরের পরে এই লোকটি ক্ষমতায় বসে দেশটিকে হাফ-পাকিস্তানে পরিণত করে। সংবিধান পরিবর্তন করে। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দায়মুক্তি দেয় এবং তাদের বিদেশে হাইকমিশনে উচ্চতর পদে নিয়োগ দেয়। কিন্তু তাদেরও রক্ষা হয়নি।

ইতিহাস আপন গতিতে চলে। জোর করে তা লেখানো যায় না। আর ইতিহাসের চাকাও কেউ পালটে দিতে পারে না। আমরা দেখেছি পঁচাত্তরের পর এমাজউদ্দীন ও ইয়াজউদ্দীনের সেই অপ্রয়াস। কালের আবর্তে তা ধুলোয় মিশে গেছে। পঁচাত্তরের খুনিরা শেখ পরিবারের কচি চারাটিকে পর্যন্ত উপড়ে ফেলেছিল। ভেবেছিল এ চারাটি বড়ো হয়ে প্রতিশোধ নেবে। তারা কখনো ভাবেনি এদেশের সংগ্রামী জনগণের কথা, যারা বঙ্গবন্ধুর সকল আন্দোলন-সংগ্রামে শরিক ছিল। কোথায় সেই নাজাত দিবস পালনকারীরা? আমরা তো মহামানুষটির শততম জন্মবার্ষিকী পালন করলাম। আসলে মানুষকে ভালোবাসলে এমন প্রতিদান পাওয়া যায়, প্রকৃতিও তাকে ছায়া দিয়ে আগলে রাখে চিরকাল। তাই পনেরোই আগস্ট শোক থেকে শক্তি অর্জনের দিন। বঙ্গবন্ধুর শোক থেকে উৎসারিত শক্তি এখন আমাদের নতুন করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করেই এগিয়ে যেতে হবে। আমাদেরও শত্রুর অভাব নেই। এখনো শত্রুরা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভেঙে ফেলতে অপচেষ্টা চালায়। তাই আমাদের একাত্তরের মতো একতাবদ্ধ থাকতে হবে। পনেরোই আগস্টের এটাই হোক প্রতিজ্ঞা।

---

*লেখক: বাংলাদেশ বেতারের প্রাক্তন স্ক্রিপ্ট রাইটার, সাহিত্যিক ও বাংলা একাডেমির ফেলো*

## 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'র সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ডাকটিকিট অবমুক্ত

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের জন্য তহবিল সংগ্রহে জর্জ হ্যারিসনের ঐতিহাসিক 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর সুবর্ণ জয়ন্তী ১লা আগস্ট। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য করতে, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এ ধরনের বড়ো একটি অনুষ্ঠান বিশ্বে প্রথমবারের মতো হয়েছিল। নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে পণ্ডিত রবিশঙ্করের প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠানটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। দিবসটি উপলক্ষে ডাক অধিদপ্তর স্মারক ডাকটিকিট, উদ্‌বোধনী খাম ও ডাটাকার্ড প্রকাশ করেছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ঢাকায় তার দপ্তর থেকে দিবসটি স্মরণে ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট ও ১০ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্‌বোধনী খাম অবমুক্ত করেন। এছাড়া ৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটাকার্ড উদ্‌বোধন করেন। মন্ত্রী এ সংক্রান্ত একটি সিলমোহর ব্যবহার করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, কনসার্টের গানের মূল কথাই ছিল বিশ্বের মানুষের কাছে বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান। তিনি বলেন, 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর বড়ো আকর্ষণ ছিলেন জর্জ হ্যারিসন ও বব ডিলান। জর্জ হ্যারিসন আটটি গান এবং বব ডিলান পাঁচটি গান গেয়েছিলেন। রিঙ্গো স্টার ও বিলি প্রেস্টন একটি করে গান করেছিলেন। লিওন রাসেল একটি একক এবং ডন প্রেস্টনের সঙ্গে একটি গান করেছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে জর্জ হ্যারিসন গেয়েছিলেন তাঁর সেই অবিস্মরণীয় গান– 'বাংলাদেশ, বাংলাদেশ'। গানটি জর্জ হ্যারিসনের নিজের লেখা এবং সুর করা। সেদিনই বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি স্বাধীনতা পাওয়ার আগেই স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে পরিচিত হয়েছিল। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের নাম শুনেছিল, জেনেছিল সেদিনের চলমান মুক্তিযুদ্ধের কথা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলার কথা।

**প্রতিবেদন : নাজিফা তাবাসসুম**

*পারিবারিক লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু*

# সাহিত্যে 'বঙ্গবন্ধু-যুগ' কেন অনিবার্য

**প্রফেসর ড. মিল্টন বিশ্বাস**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত 'বঙ্গবন্ধু-যুগ' প্রচলনের প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। আমরা সকলে জানি বাংলা সাহিত্যে 'যুগবিভাগ'কে ইতিহাসবেত্তারা বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ১৯৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যে সে অর্থে কোনো বিশেষ সাহিত্যিক কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সর্বব্যাপী প্রভাবকে মূল্যায়ন করে যুগ চিহ্নিত করা হয়নি। বরং এ ভূখণ্ডের শিল্প-সাহিত্য আলোচনা কিংবা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় '১৯৭১-পূর্ববর্তী' এবং 'মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর'–এ দুটি পর্ব ভাগ করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসকে অভিব্যক্ত করে। তবে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যিনি বাহান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আটান্নর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের মহান গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনের দীর্ঘপথ পরিক্রমায় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁর নামে সাহিত্যে যুগবিভাগ প্রচলন হওয়া যৌক্তিক বলেই আমি মনে করি।

ভাষা সাহিত্যের রূপান্তর এবং যুগান্তর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব কিংবা মহৎ প্রতিভার ওপর নির্ভর করলেও যে-কোনো ভূখণ্ডের মানুষের চেতনায় আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক অভিঘাত সাহিত্যের গতি-প্রকৃতিকে পালটে দিতে পারে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের সর্বব্যাপী প্রভাব কিংবা আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের বিশদ ব্যাপ্তি 'চৈতন্য-যুগ' (পনেরো শতক) এবং 'রবীন্দ্র-যুগ' চিহ্নিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে *কল্লোল* পত্রিকাকেন্দ্রিক সাহিত্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলা সাহিত্যের একটি নির্দিষ্ট সময়কে 'কল্লোল-যুগ' (১৯২৩-১৯৩০) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কখনোবা কাব্য আবার কখনোবা গদ্যের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়েছে যুগ কিংবা পর্ব বিভাজনের মধ্য দিয়ে। অবশ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন তথা শাসকগোষ্ঠীর প্রভাবে সাহিত্যের যুগান্তর ঘটতে দেখা গেছে বিশ্বজুড়ে। ভারতবর্ষে বিদেশি শাসক তথা তুর্কি-মোগল-ব্রিটিশরা এসে যেমন আমাদের সমাজ জীবনে পরিবর্তন এনেছে, তেমনি সেই প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর ঘটেছে। ১৯৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশে পাকিস্তানি শাসকদের অন্যায়-অত্যাচারের কারণে আমাদের স্বাধিকার চেতনার জাগরণ এবং সেই জাগরণে একদিকে যেমন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উত্থান, তেমনি দমন-পীড়নের কারণে সাহিত্যের ভাব-ভাষা পালটে যাওয়ার চিত্র অনিবার্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পাকিস্তানি রাজশক্তির দুঃশাসনে অতিষ্ঠ জনতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সেসময় সংঘবদ্ধ হয়েছিল। ফলে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য চর্চায় ১৯৫২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে। যার কেন্দ্রে ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘটনা। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধু-যুগে'র প্রথম পর্ব এদেশের সাহিত্যিকদের রাজনৈতিক অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়েই ভাব-ভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। ষাটের দশকের সাহিত্যের কথা এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে। অন্যদিকে দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কাল সংক্ষিপ্ত হলেও নতুন রাষ্ট্র বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় সাহিত্যিকরা উজ্জীবিত হয়েছিলেন– এটাও সত্য।

ইংরেজি সাহিত্যে 'এলিজাবেথীয়-যুগ' এবং 'ভিক্টোরীয়-যুগে'র সঙ্গে 'বঙ্গবন্ধু-যুগে'র তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই– ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ (১৫৩৩-১৬০৩) মৃত্যুর ২০ বছর পরও সোনালি যুগের শাসক হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। তাঁর শাসনকাল 'এলিজাবেথান-এরা' বা 'এলিজাবেথীয়-যুগ' নামে পরিচিত। শেক্সপিয়রের নাটকে 'এলিজাবেথান-এরা' ঘুরেফিরে এসেছে। রানি ভিক্টোরিয়ার সময় ব্রিটেনে ১৮৩৭-১৮৮০ সাল ছিল স্বর্ণযুগ। এলিজাবেথীয়-যুগের মতোই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ওই সময়ে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। সোনালি শস্যে ভরে উঠেছিল ইংরেজি সাহিত্য। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের সাহিত্যে 'বঙ্গবন্ধু-যুগ' হিসেবে চিহ্নিত সময়কাল একেবারেই ভিন্ন। তার পরিপ্রেক্ষিত, বাস্তবতা এবং স্বপ্ন অন্যদের থেকে আলাদা।

**দুই.**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'স্বদেশকে

একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই ব্যক্তি যাঁর মধ্যে আমরা স্বদেশকে উপলব্ধি করি। তিনি ছিলেন সমস্ত সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতিভূ। তাঁকে অবলম্বন করেই আমরা স্বদেশকে হানাদার মুক্ত করেছিলাম এবং আমাদের স্বদেশীয় সমাজ ও জনতাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলাম; গণতন্ত্রকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম। আর এখনো তাঁর মাধ্যমেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে যেমন যোগাযোগ রক্ষিত হয় তেমনি তাঁকে স্মরণ করেই আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠি।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং রাজনৈতিক ইতিহাসে 'বঙ্গবন্ধু' একটি প্রভাব বিস্তারি শব্দ। আগেই লিখেছি, স্বাধীনতার আগে ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত দেশের এমন কোনো বিষয় নেই যার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল না। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান ছিলেন। অর্থাৎ সেসময় তাঁকে কেউ অবহেলা-উপেক্ষা কিংবা বাতিল করতে পারেনি। তিনি মানুষের প্রতিটি চৈতন্যে প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং মানুষ তাঁর সম্পর্কে কিছু না কিছু বলে আত্মতৃপ্তি অর্জন করেছে। ভারতীয় সাহিত্যে মহাত্মা গান্ধী যেমন মানুষের কাছে লেখার উৎস ও প্রেরণায় পরিণত হয়েছিলেন, তেমনি বঙ্গবন্ধু অনেক লেখককে কেবল নয়, দেশের শিল্প-সাহিত্যের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুতে উন্নোচিত হয়েছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে কবির চেতনা-মননে অব্যক্ত বেদনার নির্ঝর নিঃসরণ হয়েছে। আবার বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আমাদের দুঃখ, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতেও বাংলাদেশের সাহিত্যে 'বঙ্গবন্ধু-যুগ' নাম দিয়ে একটি সময় পর্ব এখনো পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। অথচ ভারতীয় সাহিত্যে 'গান্ধী-যুগ' বলে একটি কালপর্ব নির্দিষ্ট হয়েছে। বিশেষত ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের দুই যুগের বেশি সময় গান্ধী-যুগ হিসেবে চিহ্নিত। কেন এই চিহ্নিতকরণ? কারণ এই মহামানবের জীবন ও কর্মের ব্যাপক প্রভাব। ভারতের এমন কোনো ভাষা সাহিত্য-শিল্পকর্ম নেই যেখানে গান্ধীজি নেই। জীবন ও কর্ম আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের চেতনায় নাড়া দিয়েছে। বিশেষত ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পটভূমি বিপুল সংখ্যক কবি-সাহিত্যিককে আন্দোলিত করেছে। মহানায়কের কথা, কাজ, শখ, বাগ্মিতা, বক্তব্য, তাঁর শারীরিক অঙ্গভঙ্গি সবকিছুরই দ্বারা আলোড়িত হয়েছেন সৃজনশীল ব্যক্তিরা। বাগ্মিতায় জনগণকে মুগ্ধ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বঙ্গবন্ধুর। সেজন্য সামাজিক মানুষের হৃদয়ে প্রবেশে তাঁর কষ্ট করতে হয়নি। জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহজ-সরল মাধ্যম ব্যবহার করেছেন বঙ্গবন্ধু; তাতে মানুষের কাছে সহজে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। একই কারণে গান্ধীজি পরিহিত একখণ্ড সাধারণ পোশাকই মহিমান্বিত হয়ে উঠেছিল সারা ভারতবর্ষে। গৌতম বুদ্ধ আর রামকৃষ্ণ পরমহংস– মহান ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারই ছিলেন তিনি। মানুষ ও তার সমাজকে নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে পালটানোর ক্ষমতা এদের ছিল। যদিও গান্ধীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন মিথ ও কিংবদন্তি আর তিনি তাই পালটে ফেলেছিলেন তাঁর নীতি-আদর্শ প্রচারের পন্থা। সাংবাদিকতাকে আশ্রয় করেছিলেন তিনি। *ইয়ং ইন্ডিয়া*, *নবজীবন*, *ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন* এবং *হরিজন পত্রিকা* ছিল তাঁর মুখপত্র। আর তিনি বিরামহীনভাবে পদযাত্রা করেছিলেন ভারতবর্ষের বিস্তৃত জায়গায়। এভাবে মানুষকে তিনি স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলেন। গান্ধীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রভাব জনগণের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল, চেতনাকে করেছিল পরিশুদ্ধ, ধারণা দিয়েছিল পালটে। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সাহিত্য-চলচ্চিত্র-কবিতার মুখ্য উপাদান। গান্ধী যেমন ভারতের ভাষা-সাহিত্যকে নতুন উদ্দীপনায় মুখরিত করেছিলেন তেমনি বাংলা সাহিত্যকে বঙ্গবন্ধু

তাঁর চিন্তা ও জীবনযাপন দিয়ে সচকিত করে তুলেছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘটনা গল্পের প্রয়োজনে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস ঘটনাকেন্দ্রিক হলেও বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত পরিস্থিতি, তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ, মানুষের জন্য ত্যাগের মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামবাংলার সহজ-সরল মানুষের কাছে পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টে তাঁর মৃত্যু ছিল হাহাকারের; সেই অবস্থা তুলে ধরেছেন সাহিত্যিকরা। যদিও কোনো উপন্যাসে 'মুজিববাদ'-এর অনুপুঙ্খ রূপায়ণ নেই তবু একটি 'বাঙালি আদর্শ'। তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে তুলে ধরেছেন লেখকরা। নাগরিক মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে লোকায়ত মানসে মুজিব চিরন্তন হয়ে ওঠার কাহিনিও তৈরি হয়েছে। এই মহানায়ক জীবনকে গড়ে নিয়েছিলেন বাঙালি ঐতিহ্যের পরিপূরক করে। আর শ্রমজীবী মানুষের প্রাণের নেতা হওয়ার জন্য তাঁকে হাসিমুখে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল। এই সাধারণ জনতার কাছে তাঁর পৌঁছে যাওয়া– এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তাঁর চেতনা ছড়িয়ে পড়েছিল যাত্রায়, পালায়, কীর্তনে। গান্ধীজি ভারতবর্ষকে 'সীতা মা'তে পরিণত করেছিলেন আর ব্রিটিশ শাসককে করেছিলেন রাবণের প্রতীক। *রামায়ণে*র ধারণা ঢুকিয়ে স্বাধীনতার চেতনাকে করেছিলেন প্রসারিত কেবল ধর্মভাবকে কাজে লাগিয়ে। বঙ্গবন্ধু সাধারণ জনতার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন মানুষের অধিকারের কথা বলে। এজন্যই জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে তাঁর জীবন, আদর্শ, মতবাদকে কেন্দ্র করে অজস্র কবিতা লেখা হয়েছে। চিত্রকলা ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর অভিব্যক্তিকে কেন্দ্র করে।

আবদুল গাফফার চৌধুরীর বঙ্গবন্ধু মধ্যরাতের সূর্যগ্রহণ | সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেমের স্মৃতিপটে বঙ্গবন্ধু | হারুন-অর-রশিদের বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব কী ও কেন | আবুল আহসান চৌধুরীর বঙ্গবন্ধু

পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টের পরে কবি-লেখকরা সামনে কোনো বিকল্প দেখতে পাননি। এ কারণে সরাসরি বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছেন সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে। এদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রও ধরেছেন কোনো কোনো লেখক। আর সেসময় থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করেছেন সংগোপনে। তারই পরিণতিতে বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যে নতুন চিন্তার অঙ্কুরোদগম হয়েছে। ধনী থেকে গরিব, জ্ঞানী থেকে নিরক্ষর তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত ও পরিবেশিত গানের মুগ্ধ শ্রোতা এখনো। যে জনতা নয় মাসের যুদ্ধে জীবন বাজি রেখে দেশকে শত্রুমুক্ত করেছে, সেই দেশবাসীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ টের পেয়েছিলেন সকলে। অসহায়, দুখি, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে তাঁকে সাধারণ মানুষের মতোই জীবনযাপন করতে হয়েছিল।

মূলত বঙ্গবন্ধুর গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, তাঁর অতি সাধারণ জীবনযাপন তাঁকে লেখকদের কাছে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করে। তিনি যদিও আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন কিন্তু বৃহত্তর অর্থে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল সর্বস্তরের মানুষের মাঝে। তাঁর সম্পর্কে কিংবদন্তির প্রয়োজন ছিল না, যদিও তাঁকে কেন্দ্র করে স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে নানান রহস্যময় ঘটনার প্রসঙ্গ। রাজা রাও, মুলক রাজ আনন্দ এবং আর কে নারায়ণের গল্প-উপন্যাসে গান্ধীকে যেমন কাহিনি বর্ণনায় নানা ঘটনা ও চরিত্রের বিচিত্র প্রকাশে তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি বাংলা গল্প-উপন্যাস-কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনা, শতাব্দী লালিত মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র। তাঁর আন্দোলন ছিল হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষকে অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করা ও ভালোবাসায় সকলকে কাছে টানা ছিল বঙ্গবন্ধুর অন্যতম বিশিষ্টতা। অপরাধ ও অপরাধীকে প্রশ্রয় না দেওয়া, সৎ ও নীতিপরায়ণ থাকা এবং ভণ্ডামি না করা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি না দেওয়া, জনগণের সঙ্গে প্রতারণা না করা তাঁর সমগ্র জীবনের মুখ্য আদর্শ।

**তিন.**

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছড়িয়ে গেছে গভীর থেকে গভীরে। এজন্যই বাংলাদেশের সাহিত্যে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত 'বঙ্গবন্ধু-যুগ' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার এখনই সময়। যদিও তাঁর চেতনার প্রভাব শতাব্দী থেকে শতাব্দী প্রসারিত হয়েছে এবং আগামীতে তা বহাল থাকবে, তবু মাতৃভূমির জন্য তাঁর অবদানকে স্মরণ করে সাহিত্যের 'দশক ওয়ারি যুগ বিভাজন ও হিসাব'-এর পরিবর্তে বাংলাদেশে তাঁর আদর্শের জয়গান উচ্চারিত হবে 'বঙ্গবন্ধু-যুগ' চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়ে। শোককে শ্রদ্ধার অর্ঘ্যে পরিণত করার জন্য এটি একটি যুগান্তকারী প্রস্তাব হিসেবে স্বীকৃতি পাবে বলে আমি মনে করি।

---

*লেখক : ইউজিসি পোস্ট ডক্টরাল ফেলো এবং বিশিষ্ট লেখক, কবি, কলামিস্ট, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম, নির্বাহী কমিটির সদস্য, সম্প্রীতি বাংলাদেশ এবং অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়*

# যে তারিখ বাঙালিকে কাঁদায়

## ড. শিহাব শাহরিয়ার

১৫ই আগস্ট। জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির সবচেয়ে শোকাবহ ও বেদনাঘন দিন। প্রতিবছরই ফিরে ফিরে আসে মর্মন্তুদ দিনটি। এইদিন– নদী-মেখলার এই নরম-শ্যামল মাটির প্রতিটি বাঙালির হৃদয় কেঁদে ওঠে, মন ভারী হয়ে ওঠে, মননে আঘাত লাগে। কতিপয় মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি ছাড়া সকলের অন্তর পোড়ে সারাটা দিন। ঐদিন আরও বেশি কষ্টের জল ঝরে যখন সকলের কর্ণপ্রহরে প্রবেশ করে তাঁর বজ্রকণ্ঠের সেই বলিষ্ঠ উচ্চারণ–'তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে...রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো, এদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ বাঙালির জনসমুদ্রে দেওয়া এই জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক অমর ভাষণটি যখন বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে, পাড়া-মহল্লায় মুজিবপ্রেমিকরা বার বার বাজান তখন আমাদের চেতনার নির্জীব, মলিন ও মেঘাচ্ছন্ন পথটি রৌদ্রকরোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন আবাল-বৃদ্ধ থেকে শুরু করে নবীন প্রজন্মের সকলেই মনে মনে হৃদয়-নিংড়ানো উচ্চারণ করেন–কেন এই বিশাল হৃদয়ের মানুষটিকে জঘন্য কায়দায় হত্যা করা হলো? কেন? কেন? কেন? অজস্র বার এই প্রশ্ন সকলের মনকে দগ্ধ করে। অনেকেই বলেন, বজ্রকণ্ঠের সেই প্রিয় মানুষটি আজ আমাদের নয়নের সমুখে নেই, বিশ্বাসই হতে চায় না যেন। যন্ত্রণায় যেন উচ্চারণ করেন রবীন্দ্রনাথের সেই হৃদয়-নিংড়ানো উচ্চারণ–'তুমি কী কেবলই ছবি, শুধু পটে আঁকা?'

আজ থেকে ৪৫ বছর আগে ১৯৭৫ সালের এই দিনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, মহান স্বাধীনতার রূপকার জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারী ও স্বাধীনতাবিরোধী একদল কুচক্রী-ঘৃণ্য নরপশুর দল। যারা দেশপ্রেমিক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আদর্শ-বিচ্যুত স্বার্থবাদী ও বিকৃত মানসিকতার কয়েকজন সেনাসদস্য। এই ঘৃণ্য সদস্যরা ঐদিন ভোররাতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বাড়িতে ভারী অস্ত্রের আঘাতে বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের ১৭ জন মানুষকে এক এক করে নির্মমভাবে হত্যা করে। কাপুরুষোচিত এই হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে যায়। ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো, যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটোসহ সে সময়কার সেরা সেরা রাষ্ট্রনায়ক ও সরকার প্রধানরা স্তম্ভিত, হতভম্ব, মর্মাহত হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে যিনি জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি কমনওয়েলথ সম্মেলনের ভাষণে বলেছিলেন, পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত শোষিত ও শাসিত–আমি শোষিতের পক্ষে। এই উচ্চারণ শুনে বিশ্বনেতারা মুজিবের সাহসী ও মানবপ্রেমের শ্রেষ্ঠ আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখেছেন। কেউ বলেছেন, আমি হিমালয়কে দেখিনি কিন্তু মুজিবকে দেখলাম। কেউ বলেছেন, মুজিব হলেন রাজনীতির কবি। আমাদের দেশের প্রখ্যাত কবি নির্মলেন্দু গুণও বঙ্গবন্ধুকে কবি আখ্যা দিয়ে তাঁর কবিতায় বলেছেন, 'কখন আসবেন কবি...'। এই অমর কবি মাত্র ৫৫ বছরের জীবনে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, আন্দোলন-সংগ্রাম, জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে, মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে শোষিত বাঙালিদের জন্য এনে দিয়েছিলেন হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি ও স্বাধীনতা। দীর্ঘ ২৪ বছরের পাকিস্তানি শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার ও অবহেলা থেকে জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারের প্রকোষ্ঠে বন্দি ছিলেন। সেই কারাগারে তাঁকে মৃত্যুভয় দেখানো হলে তিনি বলেছিলেন, 'আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলাদেশ আমার মাতৃভূমি।' তিনি আরও বলেছিলেন যে, তাঁকে যদি কারাগারে মেরে ফেলা হয়, তবে তাঁর লাশ যেন বাংলার মাটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সাহসী-বীর মুজিবকে পাকিস্তানি কুচক্রী মহল মারতে পারেনি। অথচ দেশীয় কুচক্রীরা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সহায়তায় মুজিবকে হত্যা করল তাঁর আপন আলয় ৩২ নম্বরের সেই বিখ্যাত বাড়িতে আর স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মাটিতে। ভাবা যায়!

স্মৃতিঘেরা সেই বাড়ির সিঁড়িতে এখনো তাঁর রক্তের দাগ রয়েছে, ঘরের দেয়ালজুড়ে এখনো বুলেটের আঘাত রয়েছে। সেদিন ঘরের ছোট্ট শিশু থেকে অসহায় নারীরাও ঘৃণিতদের পরিকল্পনা ও হত্যাকাণ্ড থেকে বাদ পড়েনি। একটি ছোট্ট কিশোরের নাম শেখ রাসেল, জাতির পিতার স্নেহের কনিষ্ঠপুত্র–ওই নিষ্পাপ মানুষটি ভয়ে ও অসহায় অবস্থায় গুলি খাওয়ার আগে আত্ম-চিৎকার করে বলেছিল, আমি আমার মায়ের কাছে যাবো। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়নি স্নেহময়ী, মমতাময়ী মায়ের কাছে, বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে ছোট্ট বুকটিকে। আরেকটি দিনের আলো তাঁর চোখে আর পড়েনি। কী গভীর চক্রান্ত ও পরিকল্পনা ছিল নরপশু ঘাতকদের। কী অপরাধ ছিল বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের প্রতিটি মানুষের?

ঘাতকরা তাঁকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, সামরিক হেলিকপ্টারে করে নিয়ে গেছে টুঙ্গিপাড়ায় সমাধিস্থ করতে। তাদের ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় সমাধিস্থ করলে কিছু দিনের মধ্যেই বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতার সমুদ্রসমান জনপ্রিয়তার কারণে ঘাতকদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে এবং জনগণ ঘুরে দাঁড়াবে। সেজন্য তাঁর বাবা-মা'র পাশে কবর দেওয়ার নামে– ৫৭০ সাবান, কাফনের কাপড়ের জন্য লুঙ্গি অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো স্থানীয়ভাবে বঙ্গবন্ধুরই বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মাধ্যমে জোগাড় করে কোনোরকম মাটিচাপা দিয়ে চলে আসে খুনিরা। একটি দেশের জাতির পিতাকে কতটা অবহেলায় দাফন করা হলো সেটিও দেখার

বিষয়। অথচ পরিবারের বাকি সদস্যদেরকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। একমাত্র বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হয় অজপাড়া গাঁয়ে, যেখানে হয়ত কোনো বাঙালি কিম্বা কোনো মানুষ যাবে না ঘাতকদের এরকমই ধারণা ছিল। কিন্তু তাদের ধারণা ও সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যে পবিত্র মাটিতে খোকা নামের ছোট্ট মুজিবের জন্ম হয়েছিল সেই টুঙ্গিপাড়া এখন বাঙালির তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন নান্দনিক বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স পরিদর্শনে আসে শত শত মানুষ। অসংখ্য বিদেশি অতিথিরাও বাংলাদেশের জাতির পিতার সমাধিস্থলে ছুটে যাচ্ছেন। সে সময়ের অবহেলিত জনপদ টুঙ্গিপাড়া এখন উন্নত জনপদে পরিণত হয়েছে। মানুষ হৃদয়ের ভালোবাসা অর্ঘ ঢেলে দেওয়ার জন্য সমাধিস্থলকে জনবহুল করে তুলেছে। নদী মধুমতীর শাখা বাইগার নদীর তীর এখন প্রাণবন্ত অঞ্চল হিসেবে মানুষের ভেতর সাড়া জাগিয়েছে।

স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে সোজা করে দাঁড় করানোর জন্য, প্রাণের সম্পূর্ণ আবেগ দিয়ে দেশটিকে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখন তাঁর সাগরের মতো বিশাল বুকটিকে নির্মম বুলেট দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়। তাঁর বুকের রক্তে ভিজে যায় ধানমন্ডির ঐতিহাসিক সেই বাড়িটির সিঁড়ি, রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায় বঙ্গোপসাগরে। এই বেদনার রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে, আনাচকানাচে, ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে পারেনি। ঘাতকরা স্তব্ধ করে দিয়েছিল সারা দেশ। কোনো প্রতিবাদ করতে দেয়নি। পথে নেমে আসতে পারেনি কেউ। নীরব কান্নায় বঙ্গবন্ধুর ভক্তরা বুক ভারী করেছে। ঘরের কোণায় বসে হাহাকার করেছে। রাস্তায় এসে প্রতিবাদ করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর সমস্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের ধরে নিয়ে কারাগারে বন্দি করা হয়েছে। খুনিচক্র সদর্পে হাজির হয় বঙ্গভবনে। বঙ্গবন্ধুর আজন্মের শত্রু পাকিস্তানের দোসর খোন্দকার মোশতাক আহমদকে বঙ্গভবনে বসিয়ে দেয়। তারা এক এক করে দখল করে বেতার-টেলিভিশনসহ সরকারি সবকিছু। সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর সেই মর্মান্তিক ভোরে কিছুই কি করার ছিল না? তাহলে ঘাতক জুনিয়র সেনা সদস্যদের নেতৃত্ব কে দিল? শোনা যায় সেনাবাহিনীর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান ক্লিনসেভ করে ভোরের বাতাসে গা এলিয়ে অপেক্ষা করছিলেন কখন আসবে মুজিব হত্যার চূড়ান্ত খবর। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ সম্প্রতি জাতীয় সংসদে এক ভাষণে জানালেন, এই জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানোর জন্য বঙ্গবন্ধু উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জিয়া এটি জানার পর একদিন তোফায়েল আহমেদকে ফোন করে বলল, সে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চায়। সেসময় বঙ্গবন্ধু গণভবনে বিশ্রাম করছিলেন। তোফায়েল সাহেব বঙ্গবন্ধুকে জানালে, তিনি জিয়াকে আসার অনুমতি দেন। জিয়া এলে তোফায়েল সাহেব তাকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কামরায় নিয়ে যান। তোফায়েল সাহেব চলে এলে, জিয়া কিছুক্ষণ কথা বলে বেরিয়ে আসেন। তারপর বঙ্গবন্ধু তোফায়েল সাহেবকে ডেকে বলেন, জানিস জিয়া কেন এসেছিল? তোফায়েল বললেন, না স্যার। বঙ্গবন্ধু তখন বললেন, জিয়া পকেটে করে একটি ছোট্ট কোরান শরিফ এনেছিল, সেটি পকেট থেকে বের করে আমার হাতের উপর রেখে বলল, স্যার আমাকে রাষ্ট্রদূত করে দেশের বাইরে পাঠায়েন না, আমি কথা দিচ্ছি জীবনে কোনোদিনই আপনার সঙ্গে বেইমানি করবো না! তাহলে এই দেখা করার কিছুদিনের মাথায় জিয়াউর রহমান কি তার কোরান শপথ রক্ষা করল? অনেক নাটকীয় ঘটনা ও অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের জন্ম দিয়ে লোভী, অকৃতজ্ঞ, বেইমান, চরম স্বার্থপর ও ক্ষমতালিপ্সু জিয়া কি সুকৌশলে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেনি? তাহলে হত্যাকাণ্ডের পেছনে তার গোপন হাত ছিল নিশ্চয়? তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুরের ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায়, এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের আগে জিয়াউর রহমান কুমিল্লা ও রাজেন্দ্রপুরে বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের সঙ্গে একাধিকবার গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে তার একশ শতাংশ প্রমাণ মেলে। কারণ যে কর্নেল তাহের তাকে কারামুক্ত করে বাঁচায় সেই তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। তেশরা নভেম্বর জেলখানার ভেতরে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার জাতীয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর মুহূর্তে একমাত্র প্রতিবাদকারী সেনা অফিসার যিনি হত্যাকারীদের প্রতিরোধ করতে ৩২ নম্বরের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাফায়াত জামিল, সেক্টর কমান্ডার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর হায়দারও কুচক্রীদের হাত থেকে রেহাই পাননি এবং পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা অসংখ্য সেনা সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে জিয়াউর রহমানের নির্দেশেই। শুধু তাই নয়, জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেই প্রখ্যাত রাজাকার শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী করে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী বানিয়েছিলেন। এত এত নির্মম হত্যাকাণ্ড ও স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য ইতিহাস কি তাকে ক্ষমা করেছে? করবে? করবে না। করেনি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতাবিরোধীদের যে উত্থান ঘটিয়েছিলেন তার মাশুল জাতি এখন হাড়ে হাড়ে দিচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে বাংলাদেশকে এখন তালেবানি রাষ্ট্র বানানোর পাঁয়তারা চলছে। এই অবস্থার ষোলোকলা পূর্ণ করেছে পরবর্তীতে জিয়ারই উত্তরসূরিরা।

বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সেই কলঙ্কময় রাতে দেশের বাইরে থাকায় তাঁরা বেঁচে গেছেন। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে একটি কালো মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টিভেজা দিনে স্বদেশে ফিরে এসে শেখ হাসিনা তাঁর প্রিয়তম পিতা, মমতাময়ী মা, আদরের ভাই, ভাইদের প্রেমময়ী বধূদের না পেয়ে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁর মর্ম-যাতনা সবাই কি অনুধাবন করতে পারবে ওভাবে। ১৯৬১ সাল থেকে যে বাড়িটিতে পরিবার নিয়ে নিজের দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে এবং আপামর বাঙালিদের মুখর পরিবেশে বঙ্গবন্ধু কাটিয়েছেন দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় সেই স্মৃতিময় বাড়িটিতে ঢুকতে গিয়ে হৃদয়ে হাহাকার করে উঠেছিল শেখ হাসিনার। কীভাবে বোঝাবেন নিজেকে? বিরানভূমির মতো নিঃসীম-নির্জন-শূন্য বাড়িটি তাঁকে কাঁদিয়েছে এবং এখনও কাঁদায়। ছোটোবোন রেহানাকে নিয়ে যতবারই এই স্মৃতিঘেরা বাড়িতে ঢোকেন ততবারই নিশ্চয় বেদনা ও কান্নায় ভেঙে পড়েন। কারণ কবির বেদনার মতোই হয়ত তাঁদের দুবোনকে নাড়ায় এবং তাড়ায় যে, 'হাঁটিহাঁটি শিশুটিকে আজ আর কোথাও দেখি না...'। সত্যি না দেখার বেদনা, না পাওয়ার হাহাকার হৃদয়কে কুড়ে কুড়ে খায়। স্নেহের রাসেলকে আঙিনায় ছুটে দেখতে না পেরে মনোকষ্টে বুক ভারী হয়, মায়ের মমতাময়ী মুখচ্ছবি না দেখতে পেয়ে, ভাইদের মুখর পরিবেশ আর বাবার বুকের মধ্যে লুকিয়ে আদর নেওয়ার চির অভাব দুজনকে দারুণভাবে পীড়িত করে। মনে করেন, কত শত দিনের কত শত সুখ-দুঃখের ঘটনা জড়িয়ে আছে এই বাড়িকে ঘিরে। বাড়ির সামনের সেই রাস্তা, সেই লেকের জল-প্রবাহ, সেই গাছগাছালি, সেই সবুজ আঙিনা, সেই সিঁড়ি, সেই কক্ষসমূহ, সেই খাওয়ার টেবিল, সেই আলমিরা, সেই খাট, সেই আসবাবপত্র, সেই পবিত্র কোরান শরিফ, জেলখানায় থাকা বাবাকে লেখা মা রেণুর সেই আবেগঘন কালো অক্ষরের চিঠি সবই আছে, শুধু নেই খুব প্রিয় সেই মুখগুলো...। আমরা ধারণা

*সপরিবার বঙ্গবন্ধু*

করি, রক্তমাখা সিঁড়ি দেখে তাঁদের দুবোনের বুক হয়ত আগুনের মতো দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। জ্বলে উঠলেও বুকের ভেতর পাথর বেঁধে নতুন করে পথ হাঁটতে শুরু করলেন তাঁরা। এই পথের সামনে রাখলেন পিতা ও জাতির পিতার মহান আদর্শ। প্রথমেই বাড়িটিকে জনগণের উদ্দেশে দিয়ে দিলেন। এটিকে স্মৃতি জাদুঘর বানালেন। এখানে এখন প্রতিদিন শত শত মানুষ এসে ইতিহাসের মুখোমুখি হয়। অবলোকন করে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের নির্মম ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের। স্মৃতির জল থেকে তুলে আনে বাঙালির সমৃদ্ধ ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনা। মনে করতে চেষ্টা করে প্রিয় নেতার, প্রিয় জাতির পিতার বর্ণাঢ্য জীবনকে।

জীবন থেমে থাকে না। তাই শেখ হাসিনাও থেমে থাকেননি। দেশে ফিরেই পিতার প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাল ধরলেন। ধীরে ধীরে দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের পথ পাড়ি দিয়ে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসীন হলেন। এসেই ১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর ১৯৯৬ সাল–দীর্ঘ ২১ বছরে অনেক জল গড়িয়ে গেছে আমাদের নদীগুলো দিয়ে। এই সময়গুলোতে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা নানাভাবে নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদেরকে পুনর্বাসিত করেছে পঁচাত্তর পরবর্তী ক্ষমতাসীনরা। তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর বদলে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পদে নিয়োগ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। শুধু তাই-ই নয় নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার যাতে না হয়, সেজন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ করা হয়। ফলে আত্মস্বীকৃত খুনিরা বীরদর্পে দেশে-বিদেশে অবাধ বিচরণ ও ঘোরা-ফেরা করেছে। হত্যাকাণ্ডের বিচারের আগে তাদের মধ্যে কোনো অনুশোচনা কোনো অপরাধবোধ কোনো বিবেকের দংশন কোনো যন্ত্রণা লক্ষ করা যায়নি।

আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে কুখ্যাত ইনডেমনিটি বিল বাতিল করে হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে। সাধারণ আইনেই বিচারকার্য সম্পন্ন হয় এবং আসামির মধ্যে ৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বাকি কয়েকজন আমেরিকা, কানাডা, ভারত, কেনিয়াসহ কয়েকজন আসামি পালিয়ে থাকায় এখনো তাদের ফাঁসি কার্যকর করা যায়নি। এই বিচার ও খুনিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মধ্য দিয়ে জাতি কিছুটা কলঙ্কমুক্ত হতে পেরেছে। কিন্তু যে ক্ষতি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোররাতে হয়েছে তা কোনোদিনই পূরণ হবার নয়। কারণ জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর অনেক কিছু দেওয়ার ছিল দেশের জন্য। তিনি বাংলাদেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত করে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। পৃথিবীর মানচিত্রে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। অনেক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে তিনি দেশ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। তখনো আমেরিকা, চীন, সৌদি আরবসহ অনেক দেশ স্বাধীন বাংলাদেশকে মেনে নিতে না পেরে স্বীকৃতি প্রদান করেনি। খাদ্যের জাহাজ বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দরে ভিড়তে দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। দেশে কৃত্রিম খাদ্যসংকট তৈরি করে দুর্ভিক্ষ কবলিত করেছিল বাংলাদেশকে। মার্কিনি হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিল, বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি। বঙ্গবন্ধুর কথা, তাঁর কর্ম, তাঁর আন্দোলন-সংগ্রাম, তাঁর দেশ গঠনের উদ্যোগ কোনোটিই তারা মেনে নিতে পারেনি। পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়ে হেরে যাওয়ার গ্লানি তাদের ভেতর থেকে কোনো অবস্থাতেই যাচ্ছিল না। ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তারা বঙ্গবন্ধুর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র করে। তাই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা দেশীয় কুচক্রীদের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। হত্যার পরে পরেই পরাজিত উল্লিখিত দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক এবং দেশ পরিচালনার ভূমিকা তারা মানতে পারেনি, মেনে নেয়নি। যদি বঙ্গবন্ধুর স্বাভাবিক মৃত্যু হতো, যদি তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডে স্বীকার না হতেন, তাহলে আজ বাংলাদেশ সোনার বাংলায় পরিণত হতো। তাই প্রতিবছর জাতীয় শোক দিবস আমাদেরকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে।

এই জাতীয় শোক দিবস কেবলমাত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-ই পালন করে এবং তারাই এই বেদনার দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে প্রবর্তন করেছেন। জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের দিনটি জাতীয় শোক হিসেবে পালন করা অবশ্যই জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একটি সাধারণ দিন নয়। ওই দিনের হত্যাকাণ্ড নিশ্চয়ই সাধারণ হত্যাকাণ্ড নয়। সেই হত্যাকাণ্ড শুধু বাঙালি জাতিকে নয়, সারা পৃথিবীর মানুষকে স্তব্ধ ও নির্বাক করে দিয়েছিল। পাপ ও অন্যায় করলে প্রকৃতি তাকে ক্ষমা করে না। তারা শিক্ষা নিতে চায় না ইতিহাস থেকে যে, অত্যাচারী, জুলুমকারী আর হত্যাকারীকে একদিন না একদিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়ই। আর প্রতিদিন বিবেকের ভীষণ যন্ত্রণায় তিলে তিলে ধ্বংস হতে হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদেরও সেই পরিণতই হয়েছে। নেপথ্যের পরিকল্পকদেরও একই পথে যেতে হয়েছে। সুতরাং অন্যায়কারীকে মানুষ কখনো ক্ষমা করে না। সৃষ্টিকর্তা তো করেন-ই না।

বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে কিছুটা কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। কারণ যে মানুষটি এই বদ্বীপাঞ্চলকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির ঋণ কখনো শোধ করার মতো নয়। প্রখ্যাত লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়ের উচ্চারণ দিয়েই শেষ করি–'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান/ ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'।

---

*লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও কিপার, জনশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর*

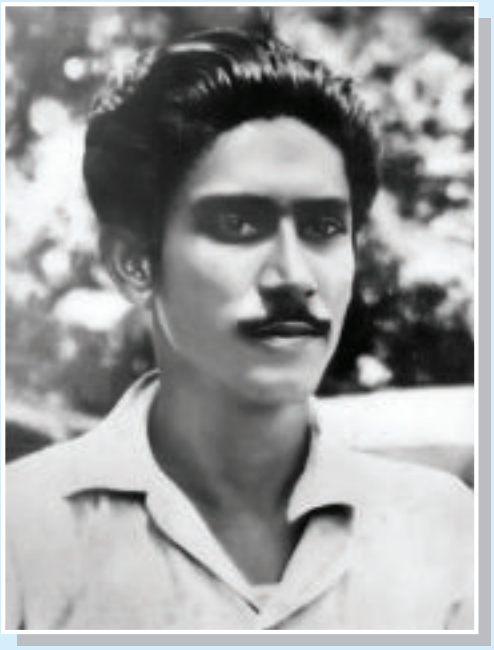

# তরুণ মুজিবের মানবিকতা ও সমাজ-সচেতনতা

ড. সুলতানা আক্তার

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানবিকতাবোধ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন এবং মানবিক সমাজ গঠন করতে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। কৈশোরকাল থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিন্তাশীল, সমাজ সচেতন, কর্তব্যপরায়ণ এবং উন্নততর মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনার অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক জীবনে তিনি কথার মূল্য বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলতেন, আর ছোটো ছোটো কাজের মধ্য দিয়ে সমাজ-সচেতনতা, স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে সমাজ কল্যাণমূলক ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়, এত অল্প বয়সে ঐ ধরনের উদ্যোগ তাঁর চিন্তার মৌলিকত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। পূর্ণ বয়স হলে তাঁর মধ্যে যে মহানুভবতা, ঔদার্য, সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিকতা, সৎ সাহস, মানুষের বিপদে-আপদে অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া, সমাজের যে-কোনো স্তর ও পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশা প্রভৃতি গুণাবলি দেখা যায়, শৈশবেই তার প্রকাশ ঘটে। বাংলা প্রবাদ– 'উঠন্ত মূলো পত্তনেই চেনা যায়', অথবা ইংরেজি প্রবচন– 'The morning shows the day' –এ দুটি প্রবাদ প্রবচনের সত্যতা প্রমাণিত হয় মুজিবের জীবনে।

গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি স্কুলের শিক্ষক রসরঞ্জন সেনগুপ্তের বাড়িতে প্রাইভেট পড়তেন। একদিন সকালে তাঁর বাড়ি থেকে পড়া শেষ করে ফিরে আসার পথে এক খালি গা বালককে দেখে নিজের গায়ের গেঞ্জি খুলে দিয়েছিলেন এবং বাড়ি ফিরেছিলেন চাদর পরে, আদুল গায়ে। বালকের কষ্ট কিশোর মুজিব সেদিন সহ্য করতে পারেননি। সেদিনও বাড়ি ফিরে পিতাকে ঘটনাটি বলেছিলেন এবং মুজিবের পিতা নিঃশব্দে ছেলের জন্য দোয়া করেছিলেন।

তখনকার যুগে ছেলেদের লেখাপড়ার যে সীমিত সুযোগ ছিল, সেই সুযোগে যারা লেখাপড়া করত তারা চার-পাঁচ মাইল দূরের গোপালগঞ্জ মহকুমা শহরের স্কুলে পড়তে এসে অন্যের বাড়িতে লজিং থেকে লেখাপড়া করত। সেইসব লজিং মাস্টাররা লজিং বাড়ি থেকে সেই যে সকালে খেয়ে স্কুলে আসত মাঝে আর তাদের খাবার কোনো সুযোগ ও সংগতি কিছুই থাকত না। বিকেলে স্কুল ছুটি হতে হতে ক্ষুধায় তাদের মুখ কেমন শুকিয়ে যেত। তা দেখে কিশোর মুজিবের মন কষ্টভারে আক্রান্ত হতো। মুজিব সেসব ছেলেদের অনেককেই নিজেদের বাড়িতে এনে সবার সঙ্গে খাবার খেতেন। সেইসব ছেলেদের খাওয়াতে পেরে মুজিবের চোখ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

কোনোদিন হয়ত দেখা গেল কোনো গরিব ছেলে তিন-চার মাইল পথ হেঁটে তপ্তরোদ মাথায় নিয়ে স্কুলে আসছে। হয়ত তাদের ছাতা কেনার কোনো সংগতি নেই। এই দৃশ্য দেখে তরুণ মুজিব নিজের ব্যবহৃত ছাতাটাই তাকে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসত। তাই মুজিবকে মাঝে মাঝেই নতুন ছাতা কিনে দিতে হতো। শুধু ছাতা! হয়ত দেখা গেল পয়সার অভাবে কোনো ছেলে বই কিনতে পারছে না। মুজিব তাঁর কেনা নতুন বইটিও সে ছেলেটিকে দিয়ে দিতে দ্বিধা করত না। এ নিয়ে ছেলের প্রতি মা-বাবারও কোনো অভিযোগ ছিল না। ছেলের এরূপ মানবহিতৈষী কাজে খুশিই হতেন তাঁরা। বরং এমন কাজে মা-বাবা তাঁকে উৎসাহই দিতেন।

সমসাময়িক ইতিহাস নিয়ে সেকালের কতজন তরুণ ভেবেছেন আমরা জানি না, তবে অনেকেই যে ভাবেননি সেটা নিশ্চয় করে বলা যায়, কারণ ভাবলে ইতিহাস বদলে যেত। আবহাওয়ার ভালোমন্দকে তিনি নিজের ভালোলাগার-মন্দলাগার দৃষ্টিতে যেমন দেখেছেন তেমনি দেখেছেন কৃষকের ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতেও। গ্রামবাংলার কৃষক পরিবারের একজন সচেতন ও অগ্রসর মানুষ হিসেবে কিশোর মুজিবের ভাবনার মূল বিষয়টিই ছিল কৃষককুলের মঙ্গলসাধন তথা তাদের উন্নতি করা। কৃষকদের কল্যাণ ভাবনার বিষয়ে একটি ঘটনায় তরুণ মুজিবের সংবেদনশীল হৃদয় ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

এক বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভালো ফসল না হওয়ায় টুঙ্গিপাড়া এলাকায় প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিয়েছিল। গাঁয়ের অধিকাংশ মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হয়। মুজিব গোপালগঞ্জ শহর থেকে টুঙ্গিপাড়া এসে সব দেখলেন ঘুরে ঘুরে, তারপর পিতার অনুপস্থিতিতেই তাঁদের গোলার সঞ্চিত ধান অভাবগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মুজিবের পিতা বাড়ি এসে সব শুনলেন, দেখলেন। কী-ই বা করবেন তিনি! মুজিব এসে অকপটে বললেন, অভাবগ্রস্ত মানুষের কষ্ট সহ্য করতে না পেরেই তিনি গোলার বাড়তি ধান তাদের মধ্যে বিতরণ করেছেন, তাদের বাঁচার ব্যবস্থা করেছেন। পিতা চিনতেন তাঁর সন্তানকে। তাই কিছু বলেননি। তাই ঘরের ধান বিলিয়ে দেওয়ার জন্য প্রাণভরে সেদিন দোয়া করেছিলেন। এভাবে পরিবারের নিকট থেকেই তিনি মানুষকে ভালোবাসার, দুখি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা পেয়েছেন। দুখি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাঁকে কোনো তত্ত্বের দরজায় হাজিরা দিতে হয়নি।

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা একটি দুরারোগ্য ব্যাধিবিশেষ। তরুণ বয়স থেকেই শেখ মুজিব সমাজ

ও সভ্যতা সচেতন মানুষ হিসেবে এ ধরনের জঘন্য মনোভাব প্রতিরোধ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে যান। বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার প্রথম সারির একজন প্রবক্তা ও নেতা। ১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জে একটি মেলার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে এ মেলার আয়োজন করে। কিন্তু অচিরেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে মেলার কর্তৃত্ব-আধিপত্য নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। খবর পেয়ে তরুণ মুজিব তাঁর সঙ্গীসাথিদের নিয়ে এসে দাঁড়ালেন দু'দলের মাঝখানে। দাঙ্গা থামে বটে তবে দাঙ্গার উসকানি-দাতাগোষ্ঠীর স্বার্থ ব্যাহত হয়েছিল মুজিবের চেষ্টায় দাঙ্গা থেমে যাওয়ায়। মেলার সামান্য ঘটনার অজুহাতে মুজিবের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় এবং তাঁকে আটক করা হয়। বাদীপক্ষের সাজানো মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে তরুণ মুজিবের সাত দিনের জেল হয়। স্কুল জীবনের গণ্ডি না পেরোতেই মুজিবের জীবনে এটাই প্রথম কারাদণ্ড ভোগ। মুজিব তাঁর প্রথম কারাজীবন সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, 'আমার যেদিন প্রথম জেল হয়, সেদিন হতেই আমার নাবালকত্ব ঘুচেছে বোধ হয়।'

*রাজশাহী সফরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৫৪*

মানুষ হিসেবেও তরুণ শেখ মুজিব অসাধারণ ছিলেন। অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তি দুর্ব্যবহার বা নির্যাতনের শিকার হলে তার প্রতিবাদ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। আর্তপীড়িত মানুষের জন্য তাঁর দরদ ছিল সীমাহীন। তাঁর নীতিবোধকে মূল্যায়ন করার ক্ষমতা তখন অনেক রাজনীতিবিদেরই ছিল না। গভীর মানবিকতা, উজ্জ্বল আদর্শবাদ, নিপুণ কর্মপ্রণালি, মূল্যবোধের মাহাত্ম্য, অকপট আচরণ, সারল্য ও সহনশীলতা তাঁর নির্লোভ নিরাসক্ত হৃদয়কে এক অপূর্ব মহিমায় ভাস্বর করে তুলেছিল। তাঁর প্রতিভার ও চরিত্রগরিমার দীপ্তিতে যারা ম্লান হয়ে পড়েছেন তাঁরাই ঈর্ষা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁর চরিত্রহননের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রভাতসূর্যের আলোর মতোই সত্য দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে সমস্ত কুয়াশা, সকল অন্ধকার দূর করে দিয়েছিল। দেশবাসীও এই দেশভক্ত সন্তানকে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

তরুণ শেখ মুজিব শুধু নীতিবান মানুষ ছিলেন না, তিনি অন্যের মতকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিতেন। তিনি যে জিনিসটাকে বিশ্বাস করতেন সেটাকে খুব গভীরভাবেই বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতের বিপক্ষে বলার জন্য সহপাঠীদের আহ্বান জানাতেন। বলতেন, আমার বক্তব্যে একমত না হলে তোমাদের যা বলার আছে বলো। যুক্তি দিয়ে যদি আমাকে বোঝাতে পারো তাহলে মেনে নেব। আর যদি যুক্তিতর্কের পর বোঝা যায় আমার সিদ্ধান্তই ঠিক তাহলে যে পদ্ধতিতে আমি কাজটা করছি সেভাবেই তোমাদের মেনে নিতে হবে।

কোনোরূপ দাম্ভিকতা, আড়ম্বরপ্রিয়তা ও অহংকারকে মুজিব প্রশ্রয় দেননি। বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই নির্দ্বিধায় বলা সম্ভব হয়েছে সমগ্র দেশবাসীকে, এদেশের প্রতিটি বাঙালিকে, প্রতিটি মানুষকে– 'আমি তোমাদেরই লোক'। কোনোরূপ উচ্ছ্বাস বা অতিশয়োক্তির স্থান ছিল না এই উচ্চারণে। বঙ্গবন্ধুর মনের ঐশ্বর্য, চিত্তের উদারতা, নিরহংকারতা এসব বৈশিষ্ট্য তুলনাহীন। দেশবাসীর ওপর তাঁর প্রভাব ছিল অমোচনীয়। বাংলাদেশের মানুষ একদিন তাঁর কথায় অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করেছে, প্রাণ দিয়েছে। কারণ তারা জানত এই মানুষটি দেশের মানুষের ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই চান না। না পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব, না প্রভুত্বের গৌরব, না ধনৈশ্বর্যের আড়ম্বরপূর্ণ মূঢ়তার সাহচর্য। বাঙালিকে বিশ্বের দরবারে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার গৌরব ব্যতীত তাঁর আর কোনো স্বপ্ন ছিল না।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। বিশ্ব মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণিত, বর্বর ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড ছিল এটি। মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী, পরাজিত দেশি-বিদেশি শক্তি এবং ঘাতক চক্র ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছিল। এর মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে শেষ করে দিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা তা করতে পারেনি, তারা শুধু বঙ্গবন্ধুর দেহকে হত্যা করতে পেরেছিল। আজ বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই, আছে তাঁর আদর্শ, দর্শন এবং মানবিকতাবোধ। তরুণদের চিন্তা ও মননে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, দর্শন এবং মানবিকতাবোধের দৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষকে নিছক উদ্‌যাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ, দর্শন ও মানবিকতাবোধের চর্চা করতে হবে। আজকের তরুণ প্রজন্ম যদি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে তাহলেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে উঠবে এবং একটি মানবিকবোধ সম্পন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতে সক্ষম হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, চেতনা, মানবিকতাবোধের চর্চা করার মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে হাজার বছর বেঁচে থাকবেন।

***তথ্যসূত্র***


১. মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু জীবন ও রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮।

২. মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু জীবন ও রাজনীতি*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮।

৩. মাহবুবুল আলম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি ও জীবনধারা (১৯২০-১৯৭৫)*, জনতা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩।

৪. শেখ হাসিনা, *শেখ মুজিব আমার পিতা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫।

৫. ভবেশ রায়, *বঙ্গবন্ধুর জীবন কথা*, এশিয়া পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৯৬।



*লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা*

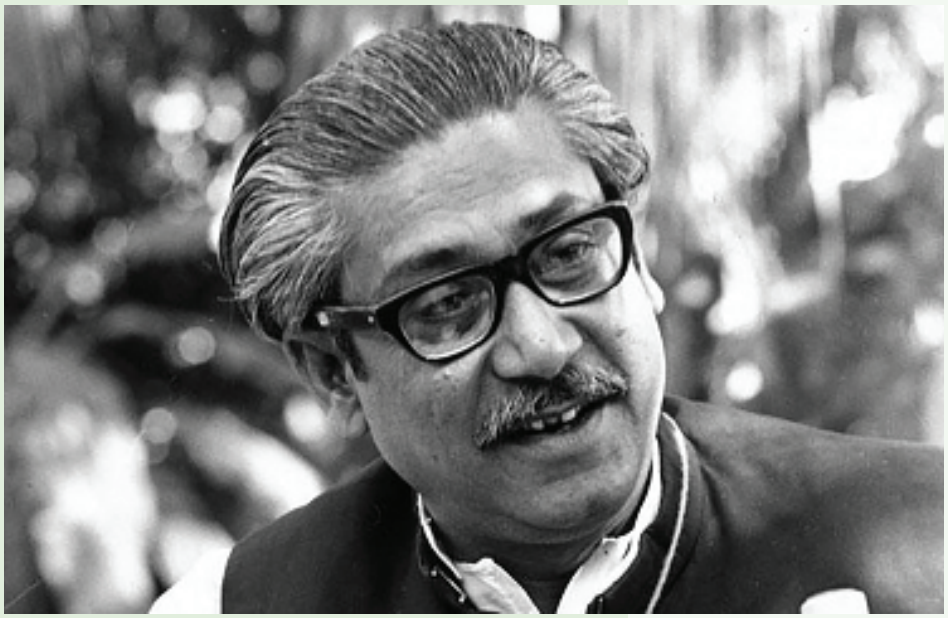

# ইতিহাসের আলোয় জাতির পিতার মুখ

## ড. এম আবদুল আলীম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত, শোষিত ও পরাধীনতার যূপকাষ্ঠে বন্দি বাঙালি জাতি তাঁর নেতৃত্বেই অর্জন করেছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। তিনি নিছক একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সংস্কৃতিমনস্ক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, মানবিক গুণে গুণান্বিত এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞায় ঋদ্ধ একজন মানুষ। রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস, জর্জ ওয়াশিংটন, থমাস জেফারসন, আব্রাহাম লিংকন, উইনস্টোন চার্চিল, মাও সেতুং, হোচিমিন, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখের ধারায় তিনি নিজেকে বিন্যস্ত করেছিলেন। তাঁর ছিল নিজস্ব রাষ্ট্রদর্শন, ছিল উপনিবেশ উত্তরকালে নতুন ধরনের আধিপত্যবাদ ও আধা-ঔপনিবেশিক ধাঁচের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্বতন্ত্র রণনীতি ও কৌশল। সেই কৌশল দ্বারাই তিনি বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের এবং অন্তরের অন্তস্তলে গুমরে মরা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল যে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে, বাঙালির ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সেই ভাষা আন্দোলনে তাঁর রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির 'সংগ্রামী চেতনার প্রতীক'। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ঢাকার রাজনীতিতে তাঁর বীরোচিত অভিষেক ঘটে। নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভাষা আন্দোলন ছিল এক ব্যতিক্রমধর্মী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এ অঞ্চলের মানুষকে চিরতরে পদানত করার দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শুরুতেই বাঙালির অস্তিত্বের মর্মমূলে আঘাত হানে। তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার অপকৌশল হিসেবে ধুয়া তোলে 'বাংলা ভাষা ইতরজনের ভাষা–উর্দু শরাফতির ভাষা', 'বাংলা ভাষা হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও বাহক' ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, সকল ক্ষেত্রে তারা বাঙালিদের পিছিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালায়। মূলত 'যে সমস্ত স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেশের কোটি কোটি মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার চার-পাঁচ বছর পরও সে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবরূপ পেল না বলে জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল সহজেই। ভাষা আন্দোলন জনসাধারণের সেই সর্বতোমুখী বিক্ষোভের বিস্ফোরণ।'

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর মুসলিম লীগ সরকার দাপ্তরিক বিভিন্ন কাজে বাংলা ভাষা বর্জন করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা সফরে এসে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন, তার সুরে সুর মিলিয়ে ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনও একই ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে তারা 'বপন করেন পাকিস্তানের সংহতি বিনাশের বিষবৃক্ষের বীজ।' অর্থাৎ এর মাধ্যমে পাকিস্তানের যে মৃত্যুবীজ তারা বপন করেছিলেন, তা ১৯৫২ সালে এসে মহিরুহে পরিণত হয় পুলিশের গুলিতে ছাত্রদের আত্মাহুতি দানের মাধ্যমে। এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে এক নতুন চেতনা জাগ্রত হলো। বিভিন্ন ঘটনা-পরম্পরা লক্ষ করে স্পষ্টভাবেই বলা যায়, একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা শুধু ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত কোনো ছক-কাটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না; একুশের চেতনা অনেক বৃহৎ, মহৎ, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বাংলাদেশের গণ-মানুষের প্রবহমান জীবনধারার মতোই বিরাট, ব্যাপক এবং গতিমান একুশে ফেব্রুয়ারির গণচেতনা। কালের প্রচণ্ড সব প্রহর অতিক্রম করেও আজও গণ-মানুষের সেই চেতনা জাগ্রত ও অগ্নিগর্ভ। এর পেছনে ছিল প্রধানত দুটি কারণ : প্রথমত, ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার পশ্চাতে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানাবিধ কারণের সম্মিলিত মিথস্ক্রিয়া কার্যকর ছিল। দ্বিতীয়ত, এই ভূখণ্ডের লোকজনের ভেতরে বাঙালি জাতিসত্তার উপলব্ধি প্রথম অঙ্কুরিত হয় এই ঘটনা থেকে কিংবা আরও যথাযথ হয় একথা বললে– বাঙালি জাতিসত্তার উপলব্ধি যে-বঞ্চনার ইতিহাস থেকে এসেছিল তা-ই বিস্ফোরিত হয় ভাষা আন্দোলনে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ভাষায় : 'একুশ একটি ঘটনামাত্র নয়, একুশ একটি চলমান ধারা। একুশ একটি চেতনা, যা বাঙালিকে প্রত্যেকটি সমস্যার মোকাবিলা করার শক্তি জোগায়।... ভাষা আন্দোলনের বড়ো সাফল্য আমাদের বাঙালি পরিচয়কে সুস্পষ্ট করা।'

## দুই

ভাষা আন্দোলন বাঙালির চেতনায় উপ্ত করে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা। এই ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ এবং তার সূত্র ধরে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে ধর্মীয় ভাবাদর্শে গড়া পাকিস্তান ভেঙে সৃষ্টি হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চালালে পূর্ববঙ্গের মানুষ তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৪৮ সালে শুরু হলেও এই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। 'দিনে দিনে যে বিপুল বিক্ষোভ পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে জমেছিল মানুষের মনে মনে, শহিদের পবিত্র রক্তের স্পর্শে যেন কোনো মন্ত্রগুণে তার বাঁধ গেল ভেঙে–উচ্ছল জোয়ারের কলধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশজুড়ে।' বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য 'এদেশের ছাত্র-জনসাধারণ জীবন দিল।' সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর, আউয়াল, অহিউল্লাহ প্রমুখের আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় স্থাপিত হলো এক অনন্য নজির। 'মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দানের এমন দুর্লভ নিদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে আর আছে কি না জানি না।'

ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সামনের সারির নেতা। এ আন্দোলনের দুই পর্বেই তিনি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেন; প্রথম পর্বে তিনি ছিলেন সংগ্রামী ছাত্রনেতা, দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদান করতে গিয়ে তিনি পুলিশি জুলুম ও কারানির্যাতন ভোগ করেন এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে জেলখানা থেকে ছাত্রনেতাদের নির্দেশনা দেন। শুধু তাই নয়, 'বাহান্ন পরবর্তী একুশের আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রসারে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এই ভূমিকা শুধু জাতীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।' ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯৫২-পরবর্তী সময়ে গড়ে উঠা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও তিনিই নেতৃত্বদান করেন। 'বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় আবিষ্কারের কাজ, যা শিল্পী-কবি-মনীষীরা করে চলেছিলেন একটি স্তরে, সেই কাজটিকে তার যৌক্তিক, রাজনৈতিক পরিণতিতে পৌঁছে দিলেন বঙ্গবন্ধু।'

*মাওলানা ভাসানীসহ প্রভাতফেরিতে বঙ্গবন্ধু, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩*

## তিন

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সংগ্রাম চলেছে। এ আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৪-এর নির্বাচন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং সর্বোপরি ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অতুলনীয়। বাংলার তরুণসমাজকে জাগ্রত ও সংগঠিত করে তিনি ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার-সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণামন্ত্র ও শক্তি-সাহস দান করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম লিখেছেন : 'তিনি (বঙ্গবন্ধু) আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দেশভাগের পূর্বে গণ-আজাদী লীগ এবং দেশভাগের পর গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও অন্যান্য সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলেন।'

দেশভাগের পর ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেখ মুজিবুর রহমান স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন এবং ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে। এর আগে কলকাতায় বসবাসকালে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রনেতা ও যুব-সংগঠক হিসেবে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাঁকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে। প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রমুখের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে তিনি হয়ে ওঠেন একজন নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক কর্মী ও দক্ষ সংগঠক। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের জি. এস. হিসেবে তিনি বাংলার ছাত্রসমাজের কাছে অর্জন করেন ব্যাপক জনপ্রিয়তা। দেশভাগের পর নবগঠিত পাকিস্তানের পূর্বাংশের রাজধানী ঢাকায় এসেই তিনি প্রগতিশীল ধারার রাজনীতি বিকাশে তৎপর হন এবং সহযোদ্ধাদের নিয়ে গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগসহ বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলে প্রগতিশীল ধারার রাজনীতির বিকাশে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং নেতৃত্বের গুণে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পূর্ববঙ্গের মানুষের আস্থার নেতা হয়ে ওঠেন। ভাষা আন্দোলনসহ পূর্ববঙ্গের মানুষের অধিকার আদায়ের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ভাষা আন্দোলন ছিল পূর্ববঙ্গের ছাত্র ও যুবসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। এতে কোনো ছাত্রসংগঠন বা ব্যক্তি একক কৃতিত্বের দাবিদার নয়। তবে এই আন্দোলনে গণ-আজাদী লীগ, তমদ্দুন মজলিস, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ ও ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ

প্রভৃতি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। ভাষা আন্দোলনের দুটি পর্বেই শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা-কর্মীদের উজ্জ্বল ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও; দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই আন্দোলন নিয়ে রচিত ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতে সেগুলো ততটা গুরুত্বসহ তুলে ধরা হয়নি। ভাষা আন্দোলনের অধিকাংশ ইতিহাসকারের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে গণ-আজাদী লীগ, তমদ্দুন মজলিস, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের নেতা-কর্মীদের অবদান যতটা গুরুত্ব পেয়েছে; পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা-কর্মীদের অবদান ততটাই অবমূল্যায়িত হয়েছে। গ্রন্থগুলো নিবিড়ভাবে পাঠ করলে এ সত্য স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট লেখকগণ ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে শুধু উপেক্ষাই করেননি; অনেক ক্ষেত্রে অন্ধ-বিদ্বেষ ও ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে তাঁর অবদানকে খণ্ডিত ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসচর্চার পথিকৃৎ বদরুদ্দীন উমর কর্তৃক সংগৃহীত দলিলপত্র এবং তাঁর রচিত বই-পুস্তকে ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত হয়েছে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা। যাদের তথ্য ব্যবহার করলে ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবের অবদানকে খাটো করে দেখানো যায়, তিনি তাদের তথ্যই ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়, শেখ মুজিবের আজীবন-বিরোধী মোহাম্মদ তোয়াহার কাছে প্রাপ্ত তথ্যের কথা। বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলনের যেসব দলিলপত্র সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন, তাতে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কয়েকটি ইশতাহার ও প্রচারপত্র স্থান পেলেও, এ আন্দোলনে সামনের কাতারে থেকে নেতৃত্বদানকারী শেখ মুজিবুর রহমান এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অধিকাংশ নেতার সাক্ষাৎকার তিনি গ্রহণ করেননি। অথচ বামঘেঁষা ছাত্র সংগঠনগুলোর অনেক সাধারণ নেতা-কর্মীর সাক্ষাৎকারও তাঁর ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। পরিতাপের বিষয়, তাঁর প্রকাশিত সাক্ষাৎকারগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকারটি হারিয়ে যাওয়ার অজুহাতে খণ্ডিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কলকাতার দেশ পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তিনি ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অবদানকে অন্ধ-বিদ্বেষের বশে অস্বীকার করেছেন, যা তাঁর ইতিহাস-গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। পরবর্তীকালে যাঁরা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসচর্চা করেছেন, তাঁদের অনেকেই বদরুদ্দীন উমরের পথ অনুসরণ করেছেন। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে, তাঁদের লেখায়ও ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান খণ্ডিত ও বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যা ভাষা আন্দোলন সমসাময়িক পত্রপত্রিকা, ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র ও ভাষাসংগ্রামীদের বয়ানের সঙ্গে পুরো মাত্রায় সঙ্গতিহীন।

### চার

বদরুদ্দীন উমর ও তাঁর অনুসারীদের অনেক মতকে গভীর বিশ্লেষণ ও যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করার পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ রয়েছে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময় নিরাপত্তাবন্দি শেখ মুজিবুর রহমান কারাগার ও হাসপাতাল থেকে ছাত্রনেতাদের ভাষা আন্দোলনে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন সে বিষয়টিও বদরুদ্দীন উমর, আহমদ রফিক, আবদুল মতিন, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ অস্বীকার করেছেন; এমনকি একে 'ইতিহাস নিয়ে কল্পকাহিনি' বলে উড়িয়ে দিতেও দ্বিধা করেননি। এছাড়া ২৭শে ফেব্রুয়ারি কারামুক্ত হয়ে ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের ভাষা আন্দোলনে যুক্ত না হওয়ায় বিষয়টি সামনে এনে তাঁরা ভাষা আন্দোলনে তাঁর অবদানকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। বদরুদ্দীন উমর ও তাঁর অনুসারীরা অস্বীকার করলেও পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার গোপন প্রতিবেদনসমূহ; সমকালীন পত্রপত্রিকা, *বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা*, তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরির বিবরণ; ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আমতলার সভায় সভাপতিত্বকারী ছাত্রনেতা গাজীউল হক, বঙ্গবন্ধুর কারাসঙ্গী মহিউদ্দিন আহমেদ, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুল মতিন, জিল্লুর রহমান, আব্দুস সামাদ আজাদ প্রমুখের স্মৃতিচারণ; গবেষক ড. মযহারুল ইসলাম, কবীর চৌধুরী, ড. আনিসুজ্জামান, ড. রফিকুল ইসলাম, ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ড. সালাহ্উদ্দীন আহমদ, ড. শামসুজ্জামান খান, ড. হারুন-অর-রশিদ, ড. মুনতাসীর মামুন, ড. আবুল কাশেম, ড. অজিত কুমার দাস, এম আর মাহবুব প্রমুখের বিশ্লেষণ; প্রত্যক্ষদর্শী আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, কে. জি. মুস্তফা, এম আর আখতার মুকুল, সন্তোষ গুপ্তসহ অনেক লেখক ও সাংবাদিকের মূল্যায়নে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে যেসব তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে, সেগুলো গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। ভাষা আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ এবং পরবর্তীকালে এ চেতনা সঞ্চারে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণের প্রামাণ্য বিবরণ গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও সমকালীন পত্রপত্রিকায় স্থান পাওয়ায় বদরুদ্দীন উমর ও তাঁর অনুসারীদের বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠতা হারিয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই তাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষপ্রসূত এসব বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে এবং শেখ মুজিব আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন। তাই কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায় : 'যতদিন বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি এবং সংস্কৃতি টিকে থাকবে ততদিন এদেশের মানুষদের চেতনায় অমর হয়ে থাকবেন ধন্য সেই পুরুষ। বাংলা মায়ের মহান সন্তান।' কারণ বাঙালির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন তিনি, আমাদের দিয়েছিলেন একটি স্বাধীন ঠিকানা।

---

*লেখক : গবেষক-প্রাবন্ধিক, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ও সাবেক ডিন, কলা অনুষদ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়*

সচিত্র বাংলাদেশ এখন
ফেসবুকে

ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

# জাতীয় শোক দিবস

## মিলন সব্যসাচী

১৫ই আগস্ট আমাদের জাতীয় শোক দিবস। আগস্টের এ দিনটি এলেই আকাশের বুক ভরে যায় রক্তিম বেদনার মেঘে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মধ্যরাতে পিতৃহারা শোকে অব্যক্ত বেদনায় কেঁদেছিল বাতাস। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর ভবনের ছাদে অন্তহীন আর্তনাদে নুয়ে পড়েছিল নীলাকাশ। বাংলার প্রতিটি ঘর থেকে ভেসে এসেছিল বৈরী পরিবেশে অবরুদ্ধ মানুষের পাঁজরভাঙা দীর্ঘশ্বাস। ঘৃণ্য ঘাতক চক্রের নির্মম অত্যাচার আর জীবন বিনাশের আতঙ্কে সে রাতে মুখ খুলে কেউ কাঁদতেও পারেনি। কী নিষ্ঠুর, কী নির্দয় এবং কতটা ভয়ংকর সে রাতের বীভৎস চিত্র। প্রায় অর্ধশত বছর পরেও বাঙালি জাতিসহ সমগ্র বিশ্বের বিবেকবান মানুষ ভুলতে পারেনি সে ভয়াল রাতের করুণ কাহিনি। রক্তে রঞ্জিত সে কালরাতে ঘাতকের গুলিতে শহিদ হন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, নির্যাতিত-নিপীড়িত মুক্তিকামী মানুষের বিশ্বনন্দিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, মাত্র দশ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল, রোজী জামাল, এক সহোদর এবং নিকট আত্মীয়-পরিজন। প্রবাসে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠকন্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং কনিষ্ঠকন্যা শেখ রেহানা।

১৫ই আগস্টের সে হত্যাযজ্ঞে আরও শহিদ হন বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য ছোটো ভাই শেখ আবু নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর ছেলে আরিফ সেরনিয়াবাত, কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজুলল হক মণি, তাঁর সহধর্মিণী আরজু মণি, নিকটতম আত্মীয় শহিদ সেরনিয়াবাত, নাঈম খান রিন্টু এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন বাঁচাতে সে রাতে দ্রুত ছুটে আসা রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদসহ কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

১৫ই আগস্ট রাতে বঙ্গবন্ধু অনাগত দিনের কর্মসূচিতে দৃষ্টিপাত করে ধানমন্ডিতে অবস্থিত বাসভবনে ক্লান্তির কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমের ঘোরে যখন বিভোর ঠিক তখনই একদল তরুণসেনা জলপাইরঙা ট্যাংক দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনটি (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর) ঘিরে ফেলে। তারপর বিরতিহীনভাবে গুলি ও গোলাবর্ষণ শুরু করে। ক্রমাগত বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর সপরিবারের সদস্য ও দূরদূরান্ত থেকে আগত অতিথিবৃন্দ ও অন্যান্যরা অকালমৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম এ হত্যাযজ্ঞে উল্লাসে মেতে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুবিরোধী আওয়ামী লীগের নীতিভ্রষ্ট সদস্য এবং কিছু ক্ষমতা লোভী সামরিক কর্মকর্তা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশ্বাসঘাতক নব্য মীরজাফর খোন্দকার মোশতাক আহমদ। জাতীয় পত্রিকায় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সিআইএ'কে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ইন্ধনদাতা হিসেবে দায়ী করা হয়। ১৬ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর লাশ হেলিকপ্টারে করে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যায়। মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে সামরিক জান্তাদের তত্ত্বাবধানে দাফন করা হয়। অন্যান্য শহিদদের লাশ ঢাকার বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি পাকিস্তানের পদলেহী ও দেশদ্রোহী ঘৃণ্য-ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ন্যায়-নীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বদেশ প্রেমের সুমধুর স্মৃতি, মহৎ কীর্তি ও স্বাধীন-সার্বভৌম এ ভূখণ্ডকে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করার ব্যর্থ প্রয়াসে মত্ত ছিল। ষড়যন্ত্রকারীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় চিরদিনের জন্য মুছে দিতে চেয়েছিল শেখ মুজিবের নাম। তাদের সে ভ্রান্তবাসনা কিছুতেই বাস্তবায়িত হয়নি। ইতিহাস বিকৃত করেও বাঙালিদের হৃদয় থেকে মুজিবের নামটি তারা মুছে ফেলতে সক্ষম হয়নি। বরং জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মৃত বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির এবং বিশ্ববাসীর কাছে আরও বেশি শ্রদ্ধেয় ও সমাদৃত হয়েছে।

১৫ই আগস্ট এখন রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালিত হয়। অথচ সুদূর অতীতে আওয়ামী লীগ সরকার ব্যতীত যে-কোনো সরকারের আমলে এ দিবসটি ছিল অবহেলিত। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী দল ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সময় সরকার গঠন করার পর বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। খুনিদের রক্ষা করার লক্ষ্যে তাদের মন্ত্রী, সচিব ও রাষ্ট্রদূত করেছিল। স্বঘোষিত খুনিদের শেষ রক্ষা হয়নি। ১৯৭৫ সালের পরে এদেশে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করাও অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ ছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের প্রাণজুড়ানো ভাষণ তখন কোথাও শোনা যেত না। আমরা টেপরেকর্ডার বাজিয়ে গোপনে গোপনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতাম। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ভাষণ শুনে আমাদের দাদা-দাদিরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন আর বলতেন–আহারে এমন সোনার মানুষ, জনদরদি বাংলায় আর কী হবে? হত্যাকারীরা ষড়যন্ত্র করে নতুন প্রজন্মের কোমলমতি শিশু-

কিশোরদের বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কিছুই জানতে দিত না। শিশু-কিশোর উপযোগী পত্রপত্রিকায় বঙ্গবন্ধু বিষয়ক কোনো লেখা কিংবা তাঁর ছবিও প্রকাশ করা হতো না। লেখকবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা, গল্প, গান, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নাটক ইত্যাদি লিখে সংরক্ষণ করে গোপনে রেখে দিতেন। তবুও দেশে-বিদেশে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এ পর্যন্ত হাজার হাজার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে অনন্তকাল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০-২০২১ সালকে মুজিববর্ষ ঘোষণা করেছেন। মুজিববর্ষকে আরও বেশি স্মরণীয়-বরণীয় করে রাখতে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে দেশে-বিদেশে প্রকাশ পাচ্ছে অনেক নিত্যনতুন গ্রন্থ। তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বপ্রামাণ্য দলিল হিসেবে জাতিসংঘে সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁকে নিয়ে কোনো কিছু বলতে বা লিখতে গেলেই হাজারো প্রসঙ্গ ভিড় করে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তারপর জাতীয় সংসদে গুরুত্বপূর্ণ এক অধিবেশনে অধিকাংশ সংসদ সদস্যদের সম্মতিক্রমে ১৫ই আগস্টকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেন।

২০০১ সালে জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বাধীন চারদলীয় সরকার জাতীয় শোক দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়। ষড়যন্ত্র এখানেই শেষ নয়। বিধি সংশোধনের মাধ্যমে সরকারিভাবে নির্ধারিত দিন ব্যতীত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ১৫ই আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস পালনের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্তদিনে সরকারি ছুটি পুনর্বহাল রাখে।

বঙ্গবন্ধুর খুনি খোন্দকার মোশতাক আহমদ ১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে। জেনারেল জিয়াউর রহমান ও পাকিস্তানপন্থি প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের বৈধতা দেওয়া হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ই আগস্ট শেখ হাসিনা সরকার সংসদ অধিবেশনের মাধ্যমে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ রহিত করে। বহুবছর বিচারের রায় বিলম্বিত হওয়ার পরে দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রহর শেষে সপরিবার বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। দেশি-বিদেশি রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অনেক কণ্টকিত পথ পেরিয়ে অবশেষে ২০১০ সালের ২৭শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি বরখাস্ত কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, লেফটেনেন্ট কর্নেল (অব.) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, মেজর (অব.) বজলুল হুদা, লেফটেনেন্ট কর্নেল (অব.) এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার) এবং লেফটেনেন্ট কর্নেল (অব.) মুহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি)-কে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে বর্তমান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার সর্বপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০২০ সালে ফাঁসির মঞ্চে আরেক পলাতক খুনি মাজেদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। খুনিচক্রের কেউ কোনোভাবেই রক্ষা পাবে না। সকল খুনিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলেই এদেশের জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার, কৃষক, শ্রমিক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শিক্ষক তথা সর্বস্তরের মেহনতি মানুষের অতৃপ্ত আত্মা শান্তি পাবে। বিচারের রায় আর নিভৃতে নীরবে কাঁদবে না। বিশ্বের দরবারে বাঙালি জাতি কলঙ্কমুক্ত হবে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির হৃদয়ে বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন। কেবল মৃত্যুর মাঝেই মহৎ মানুষের জীবন ফুরিয়ে যায় না। যতদিন এই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে, ততদিন বঙ্গবন্ধুর অমর কীর্তি থাকবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, যুগ থেকে যুগান্তরে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির বাতিঘর হয়ে থাকবেন। তাঁর সুমধুর স্মৃতি মহাকালের কীর্তি অমর, অক্ষয়। দেশি-বিদেশি কবিকুলের নিবেদিত কবিতায় মুজিব মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে আছেন এবং থাকবেন। অন্তরের অন্তস্তল থেকে গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে কবি ও ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায়ের কালজয়ী কবিতার ছন্দে ছন্দে অনাবিল আনন্দে বলতে বড়ো সাধ হয়–

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয়, হবে হবে জয়, জয় মুজিবুর রহমান।

২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে অর্থাৎ 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের মহতী উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক বিদ্যালয়মুখী শিক্ষার্থী, ছোট্ট সোনামণিদের সবাইকে চিঠি লিখেছেন। চিঠির যে অংশে শোকাশ্রুসিক্ত আগস্টের কথা উল্লেখ করেছেন সে অংশটুকু এখানে তুলে ধরা হলো:

প্রিয় বন্ধু

ঘাতকের নির্মম বুলেট কেড়ে নিয়েছে জাতির পিতাকে। তাঁর নাম বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওরা পারেনি। ঘাতকেরা বুঝতে পারেনি বঙ্গবন্ধুর রক্ত ৩২ নম্বর বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে ছড়িয়ে গেছে সারা বাংলাদেশে। জন্ম নিয়েছে কোটি কোটি মুজিবের। তাই আজ জেগে উঠেছে বাংলাদেশের মানুষ সত্যের সন্ধানে। ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না। সত্যকে মিথ্যা দিয়ে দাবিয়ে রাখা যায় না। আজ শুধু বাংলাদেশ নয়, জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশকে বিশ্ব চিনে নিয়েছে তারই ত্যাগের মহিমায়।

পরিশেষে প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলব বঙ্গবন্ধুর অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম এবং সফলতার সোনালি ফসল আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে আমরা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলব মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে। জয় হোক বঙ্গবন্ধুর। জয় হোক মুক্তিকামী মানুষের। জয় বাংলা।

---

*লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক ও শিশু সাহিত্যিক*

**শুদ্ধাচার করলে লালন**
**আলোকিত হবে জীবন**

# বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা অবিস্মরণীয় এক নারী

**আখতারুল ইসলাম**

বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী একটি নাম, একটি ইতিহাস। একজন সাধারণ গৃহবধূ হয়েও সংগ্রামী, সাহসী নারী বঙ্গমাতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম চিরকাল ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর পাশে তেমনি জাতি চিরকাল মনে রাখবে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছাকে।

শেখ ফজিলাতুন নেছা জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩০ সালের ৮ই আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। পিতা জহুরুল হক, মাতা হোসনে আরা বেগম। তাঁর ডাক নাম রেণু। গায়ের রং ফুলের মতো ছিল, সবাই তাঁকে আদর করে রেণু ডাকতো। খুব অল্প বয়সে তিনি পিতামাতাকে হারান। এতটুকু শিশুর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁর দাদা শেখ আবুল কাশেমের নাতি শেখ মুজিবের সাথে বিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর মাতা সায়ারা খাতুনের আদরযত্নে লালিত হতে থাকেন।

শেখ ফজিলাতুন নেছা প্রথমে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে এবং পরবর্তী গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করেন। পাঠ্য শিক্ষার পাশাপাশি তিনি ধর্ম শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষা অর্জন করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের বয়স যখন কুড়ি বছর তখন তাঁর সঙ্গে শেখ ফজিলাতুন নেছার আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয় এবং রেণু হন শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। ছোটোবেলা থেকে একসঙ্গে একই বাড়িতে বেড়ে উঠায় বেগম মুজিব শেখ মুজিবকে খুব ভালো করে জানতেন এবং বুঝতেন। শেখ মুজিবের রাজনীতির প্রতি ভালোবাসা, জনমানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং অসীম দেশপ্রেম বেগম মুজিব মন থেকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কেবল স্নেহময়ী স্ত্রী ও স্নেহময়ী মাতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন নির্লোভ ও আত্মত্যাগী মহীয়সী নারী। বঙ্গবন্ধুর কাছের সাথি, বিচক্ষণ উপদেষ্টা ও পরামর্শকারী। তিনি রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের আদর্শ ছিলেন। বলা যায়, বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ ফজিলাতুন নেছা একে অপরের সম্পূরক। তিনি যে-কোনো পরিস্থিতি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, শান্ত, অসীম ধৈর্য ও সাহস নিয়ে মোকাবিলা করেছেন।

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের পথ চলার আজীবন সহযাত্রী ও অনুপ্রেরণাকারী ছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু যখন কলকাতা কলেজের ছাত্র রাজনীতি করতেন তখন বেগম মুজিব সাহস যোগাতেন তাঁকে। তাঁর প্রয়োজনে নিজের জমিজমা বিক্রি করে টাকা পাঠাতেন। বঙ্গবন্ধু বার বার কারারুদ্ধ হলে বেগম মুজিব গৃহ সামগ্রী বিক্রি করেছেন কিন্তু শেখ মুজিবের বাদ্যযন্ত্র, গানের রেকর্ডগুলো কখনো হাতছাড়া করেননি। বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শেখ ফজিলাতুন নেছা আড়াল থেকে সর্বান্তকরণে সহযোগিতা করেছেন।

সকল দুঃখ-নির্যাতনবরণ করে বঙ্গবন্ধুর ধারাবাহিক আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছেন এই সংগ্রামী নারী। পাঁচ সন্তানের জননী তিনি। তাঁর প্রথম সন্তান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে শেখ কামাল ও ১৯৫৪ সালের ২৮শে এপ্রিল শেখ জামালের জন্ম হয়। স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তাকে বঙ্গবন্ধু সব সময় মর্যাদা দিতেন ও সম্মান করতেন। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে বঙ্গবন্ধু স্ত্রীর পরামর্শ নিতেন। ১৯৫৬ সালে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। মন্ত্রীর স্ত্রী হিসেবে সরকারি বাসভবনে ওঠেন। কিন্তু দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলে, সরকারি বাসভবন ছেড়ে ছোট্ট একটা বাড়িতে ওঠেন এবং তা হাসিমুখে মেনে নেন বঙ্গমাতা। এর কিছুদিন পর ১৯৫৭ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় শেখ রেহানার জন্ম হয়।

বঙ্গবন্ধু বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক কারণে রাজনীতির পাশাপাশি আলিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি নেন। এ কারণেই ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটির নির্মাণকাজ শুরু করেন ফজিলাতুন নেছা মুজিব। ১লা অক্টোবর থেকে এ বাড়িতে বসবাস শুরু করে মুজিব পরিবার। ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিবের কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল। স্বামী গ্রেপ্তার হলে পাঁচ সন্তানের জননী বেগম মুজিব কখনো কখনো দল পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেন এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে দেওয়া মামলা তদারকি করতেন। গহনা বিক্রি করে ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলন পরিচালনা করতেন তিনি। হাসিমুখে অবর্ণনীয় কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করে অভূতপূর্ব ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন এই মহীয়সী নারী।

১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনের সর্বশেষ ঘটনায় ৭ই জুনের হরতাল। বঙ্গবন্ধু কারাগারে। বেগম মুজিবের একান্ত প্রচেষ্টায় হরতাল সফল হয়। তিনি গোপনে কমিটির নেতা-কর্মীদের সংগঠিত করেন। ১৯৬৭ সালের ১৭ই নভেম্বর বঙ্গবন্ধু যখন কারাগারে তিনি বঙ্গবন্ধুর প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনাকে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সাথে বিয়ে দিয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। ১৯৭৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র নামক রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় বিচলিত না হয়ে সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। ন্যায়-নীতির প্রতি তিনি ছিলেন অবিচল ও অটল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়েরের পর গোয়েন্দা সংস্থা তাঁকে কয়েকবার জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং গ্রেপ্তারের হুমকি দেয়। কিন্তু নীতির কাছে নতি স্বীকার করেননি এই মহীয়সী নারী।

১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে জনগণকে বিভ্রান্ত করার কৌশল হিসেবে ১৭ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার রাওয়ালপিন্ডিতে

*পিতা-মাতার সঙ্গে সস্ত্রীক বঙ্গবন্ধু*

গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করে। সেখানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়।

অনেক রাজনৈতিক সহকর্মী এর পক্ষে মত দিলেও লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা প্যারোলে মুক্তির বিপক্ষে ছিল। বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবও প্যারোলে মুক্তির বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর সঠিক পরামর্শের কারণেই বঙ্গবন্ধু এ বৈঠকে উপস্থিত থাকা থেকে বিরত থাকেন। বঙ্গমাতার পরামর্শে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এই মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং সকল বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে।

নেতারা বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বেগম মুজিবকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। বলতেন, শেখ মুজিবকে মেরে ফেলবে, আপনি বিধবা হবেন। এই কথা শুনে বঙ্গমাতা বলেছিলেন, আগরতলা মামলার আরো ৩৩ জন অভিযুক্ত বন্দি আছেন, তাঁদের কী হবে! তাঁদের স্ত্রীরাও তো বিধবা হবেন। তাঁদের ফেলে তিনি কীভাবে প্যারোলে যাবেন। আর বাংলার মানুষের কী হবে? আমিতো শুধু নিজের কথা স্বার্থপরের মতো ভাবতে পারি না। আমার বিশ্বাস তাঁর কিছু হবে না। তিনি সম্মানের সাথে সকলকে নিয়ে মুক্তি পাবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর আত্মবিশ্বাসেরই জয় হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হানাদার বাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার হলে বঙ্গমাতা সন্তানদের নিয়ে কয়েকবার স্থান পরিবর্তন করেন। হানাদার বাহিনী তাঁকে মগবাজার থেকে গ্রেপ্তার করে ধানমন্ডির ১৮নং রোডের একটি বাড়িতে বন্দি রাখে। বন্দি অবস্থায় বেগম মুজিব কোনো আপোশ করেননি।

১৯৭১ সালের ২৭শে জুলাই ঢাকায় একটি হাসপাতালে শেখ হাসিনা ও ড. ওয়াজেদ মিয়ার প্রথম সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়ের জন্ম হয়। বর্বর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মেয়ের দুর্দিনে ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে পাশে দাঁড়াতে দেয়নি। দেশ স্বাধীন হবার পর দিন ১৭ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁকে উদ্ধার করতে পাকিস্তানের সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করানোর চেষ্টা করে। ভেতর থেকে বঙ্গমাতা হুকুম করেন, হাবিলদার হাতিয়ার ডাল দো। তাঁর সেই হুকুমে একে একে হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে তারা।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরলে বঙ্গমাতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ বঙ্গবন্ধুর সাথে গড়তে আত্মনিয়াগ করেন। বঞ্চিত মা-বোনের সহযোগিতা করেন। চিকিৎসা করান। সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেন। অভিভাবকরূপে মুক্তিযুদ্ধে লাঞ্ছিত অনেক মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

নারীদের উন্নয়নে কাজ করার জন্য ১৯৭৪ সালের ৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বেগম ফজিলাতুন নেছা সরকার প্রধানের স্ত্রী হয়েও সাধারণ জীবনযাপন করতেন।

বঙ্গবন্ধুর আমৃত্যু সঙ্গী এই মহীয়সী নারী পুরো পরিবারসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী, কর্তব্যনিষ্ঠ, সহনশীল, দূরদর্শী, বিচক্ষণ সাহসী ও দেশপ্রেমিক। আমাদের অনিমেষ অনুপ্রেরণার উৎস। জাতির পিতার সহধর্মিণী হিসেবে বাঙালি চিরকাল ভালোবাসায় স্মরণ করবে এই মহীয়সী নারীকে।

**তথ্যসূত্র**


১। *মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন নেছা*– বেবী মওদুদ
২। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*– শেখ মুজিবুর রহমান
৩। *কারাগারের রোজনামচা*– শেখ মুজিবুর রহমান
৪। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)– মোনায়েম সরকার
৫। *শেখ মুজিব আমার পিতা*– শেখ হাসিনা
৬। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*– শামসুজ্জামান খান
৭। *বঙ্গবন্ধু সহজপাঠ*– ড. আতিউর রহমান
৮। *খোকা থেকে জাতির পিতা*– মশিউর মালেক
৯। *জাতির জনক: তাঁর সারা জীবন*–শিশু একাডেমি
১০। উইকিপিডিয়া; গুগোল
১১। *শিশু* (শিশু একাডেমি) বিভিন্ন সংখ্যা
১২। প্রবন্ধ– খালেক বিন জয়েনউদদীন
১৩। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*– মনি হায়দার
১৪। *ধানশালিকের দেশ*– বঙ্গবন্ধু সংখ্যা
১৫। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ১৫ই আগস্টের বিশেষ সংখ্যা
১৬। *ইতিহাসের আলোয় শেখ মুজিবুর রহমান*– মুনতাসীর মামুন



*লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক*

**ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।**

**পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।**

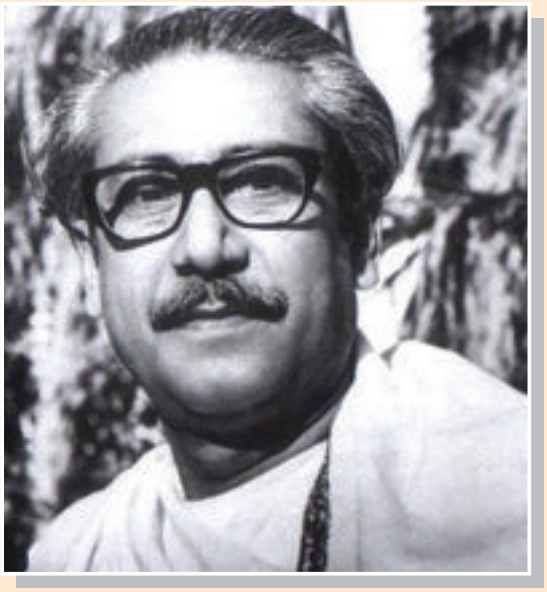

# বঙ্গবন্ধুর আইনি ভাবনা

## সাহিদা বেগম

একজন মানুষের জন্যে দেশের আইন পরপর তিনবার পরিবর্তন হয় এমন ঘটনা পৃথিবীতে বিরল। আমার জানা মতে, পৃথিবীর এমন বিরল ঘটনাটি ঘটেছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে। দেশের আইন পরপর তিনবার পরিবর্তন হয়েছিল এবং সেটা হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে।

প্রথমবার হয়েছিল পাকিস্তান আমলে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় তখন দুর্দান্ত প্রভাবশালী ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মো. আইয়ুব খান। দশ বছর ধরে টানা দেশ শাসন করেছে দুর্দান্ত প্রভাবে। মার্শাল আইন জারি করে দেশবাসীর বুকের উপর চেপে বসে। তারপর বুনিয়াদি গণতন্ত্র নামক নিজের উদ্ভাবিত এক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতারোহণকে পাকাপোক্ত করে নেয়।

অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারের শোষণ, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে শোষণ–দুর্নীতি দূর করার পথ হিসেবে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দল আওয়ামী লীগের তরফ থেকে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। ছয় দফা ধীরে ধীরে জনগণের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ছয় দফা হয়ে উঠল পূর্ব পাকিস্তানিদের তথা বাঙালির মুক্তির সনদ।

বাঙালির নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির কাছে হয়ে উঠলেন মুজিব ভাই। শেখ মুজিব তাঁর ছয় দফা কর্মসূচি নিয়ে দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। শেখ মুজিবের এই ছয় দফা কর্মসূচিকে স্তব্ধ করার কৌশল হিসেবে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আইয়ুব সরকার একের পর এক মামলা দিতে থাকে দেশের বিভিন্ন আদালতে। সর্বশেষ এবং ভয়ংকর প্রচেষ্টা হিসেবে দায়ের করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' ১৯৬৮ সালে। পাকিস্তান Penal Code-এর কিছু সংশোধনী এনে দণ্ডবিধির ১২১(ক) ধারা ও ১৩১ নং ধারা মোতাবেক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় এবং এই বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলাটি দায়ের করা হয়। শুধুমাত্র শেখ মুজিবকে এই মামলায় ফাঁসানোর বা জড়ানোর জন্যে। সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন করার প্রচেষ্টার মূল হোতা ছিলেন পাকিস্তান নৌবাহিনীর বাঙালি অফিসার কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন; পাকিস্তান নৌবাহিনীতে চাকরি করে পাকিস্তান সরকার তথা পশ্চিমাদের অত্যাচার-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বাধীন করে ফেলার এক দুঃসাহসিক স্বপ্নে একটি বিপ্লবী কমান্ডো বাহিনী গড়ে তুলেছিল পাকিস্তান নৌবিমান ও সেনাবাহিনীর চাকরিরত ও অবসরপ্রাপ্ত কিছু সেনা সদস্য।

পাকিস্তান সরকারের কাছে সেনা সদস্যদের এই গোপন প্রস্তুতির কথা ফাঁস হয়ে গেলে সেনা ও প্রতিরক্ষা আইনে দুই হাজারের মতো লোককে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা। সারা পাকিস্তান তন্ন তন্ন করে খুঁজে এক বছরের বেশি সময় ধরে গোপন গ্রেপ্তার অভিযান চালায় সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা।

গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্য থেকে বেছে ৩৫ জনকে আসামি করে একটি মামলা সাজানো হয়। প্রাথমিক চিন্তায় পাকিস্তান সরকার ধৃত ব্যক্তিদের সামরিক আইনে মার্শাল কোর্টে বিচার করার চিন্তাভাবনা ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পরামর্শে ছয় দফার প্রবর্তক বাঙালির জনপ্রিয় নেতাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলানোর চক্রান্তে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবকে এই মামলায় জড়ানো হয় এবং নতুনভাবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। শেখ মুজিব অবশ্য অনেক আগে থেকেই অন্যান্য রাজনৈতিক মামলায় জেলের ভেতর ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে নতুনভাবে গ্রেপ্তার দেখিয়ে নতুন মামলা সাজানো হয়। যার নাম ইতিহাসে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই মামলায় গ্রেপ্তারকৃত ৩৫ জন আসামির মধ্যে ২৮ জনই ছিলেন পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সেনা ও অফিসার। তাঁদের বিরুদ্ধে মার্শাল কোর্টে গোপন বিচারের মাধ্যমে সেই সব দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বাঙালি সেনা ও অফিসারদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিলে দেশবাসী কেউ টের পেত না বা দেশবাসীর কিছু বলার থাকত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আইয়ুব খান আর তার রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদের দূরদর্শিতার অভাবে তাদের পরামর্শ মতো একমাত্র রাজনৈতিক নেতা আসামি হিসেবে শেখ মুজিবকে যুক্ত করা। আইয়ুব খানের পরামর্শদাতাদের পরামর্শ ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানকে জড়িয়ে মামলা করে দেশের জনমনে শেখ মুজিবকে ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে শেখ মুজিবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানো সরকারের পক্ষে সহজ হবে। ছয় দফা স্তব্ধ করা যাবে এবং দেশপ্রেমিক জনগণের মধ্যে পাকিস্তান প্রেম শক্ত ও মজবুত হয়ে উঠবে। সরকারের গোপন এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য শেখ মুজিবকে এই মামলায় এক নম্বর আসামি করা হয় এবং মামলার নাম দেওয়া হয় 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য।'

পাকিস্তান প্যানাল কোড সংশোধন করে নতুন একটি আইন তৈরি করে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে কুর্মিটোলা সেনা ছাউনির ভেতরে গোপন ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্তদের বিচার শুরু করে পাকিস্তান সরকার। এই প্রথম পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক শুধুমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য ব্রিটিশ শাসকদের তৈরি করা পাকিস্তান প্যানাল কোড সংশোধন করে নতুন আইন করা হয় শেখ মুজিবের বিচার করার জন্য।

দ্বিতীয় বার দেশের আইন পরিবর্তন করা হয় বাংলাদেশে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ইতিহাসের সেই কলঙ্কময় অধ্যায়ের

সূচনা হয়। একটি কুচক্রীমহল ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করার পর খুনিদের বিচার যাতে না করতে পারে কোনো সরকার তার জন্য, খুনিদের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করে খুনিদের রক্ষা করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ করে দেওয়া হয় কুখ্যাত এই আইন 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' জারি করে।

শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর জন্য, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ করার জন্য এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

বঙ্গবন্ধুকন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬ সালে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করে আর একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। বাংলাদেশ প্যানাল কোডের ৩০২ ধারাসহ অন্যান্য ধারায় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কাজ চালু হয়। ইচ্ছে করলে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা প্রতিহিংসাপরায়ণ হলে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দ্রুত খুনিদের বিচার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা চাননি। দেশের প্রচলিত আইনে খুনিদের বিচার হয়েছে। জঘন্য খুনিরা সাজা পেয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান শাসনামল থেকে শুরু করে বাংলাদেশ আমলে পর পর তিনবার বঙ্গবন্ধুর জন্য দেশের আইন পরিবর্তন, সংশোধন এবং নতুন আইন জারি করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্মজীবনে আইনজীবী হওয়ার মানসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯৪৮ সালে। তাঁর ছাত্রজীবন, বেড়ে ওঠাকালের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততার কারণেই কর্মজীবনে তিনি আইনজীবী হতে চেয়েছিলেন। আইনে পড়াশোনা থাকলে সে স্থান তাঁর রাজনৈতিক জীবন গঠনে সহায়ক হবে এই দূরদৃষ্টি তাঁকে আইন পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে। পিতা লুৎফর রহমানের কর্মক্ষেত্র ছিল কোর্ট-কাচারি, সেদিকটিও হয়ত তাঁকে আকর্ষণ করেছে আইনজীবী হতে।

আবার তখনকার রাজনৈতিক নেতাদের জীবন এবং কর্ম তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বঙ্গবন্ধু কিশোর বয়স থেকে রাজনীতির ছোঁয়া পেয়েছেন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র থাকাবস্থায় যখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁদের স্কুল পরিদর্শনে এলেন। পরিদর্শন শেষে দুজন নেতা যখন স্কুল ত্যাগ করে যাচ্ছিলেন বালক শেখ মুজিব নিজের অনুসারী কজন ছাত্র নিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ নেতাদের পথ আগলে দাঁড়ালেন স্কুল হোস্টেলের ছাদ দিয়ে পানি পড়া বন্ধের দাবিতে।

পরবর্তীতে এই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলেন শেখ মুজিবের শিক্ষাগুরু, রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আইনজীবী। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে ছিল তাঁর হৃদ্যতা। আর তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতি অঙ্গন ছিল উত্তপ্ত। বঙ্গবন্ধু যখন কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র, বেকার হোস্টেলে বসবাস, সেই সময়ে সারা ভারতজুড়ে স্বাধীনতার আন্দোলন উচ্ছ্বসিত। পুরো ভারতবাসী ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারত ছাড় আন্দোলনে উজ্জীবিত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগের নেতৃস্থানীয় নেতাদের প্রায় সকলে বিলেতে পড়াশোনা করা ব্যারিস্টার। কংগ্রেস নেতা করম চান গান্ধী, জওহর লাল নেহেরু, সরদার প্যাটেল, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, মুসলিম লীগের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সকলেই ছিলেন আইনজীবী। সোহরাওয়ার্দীর একনিষ্ঠ কর্মী এবং অনুগামী হিসেবে শেখ মুজিব যখন স্থির করেই ফেলেছেন জীবনে রাজনীতি করবেন তখন নিজেকে সেলক্ষ্যে পৌঁছানোর এবং নিজেকে সেভাবে গড়ে তোলার জন্য আইন পড়া অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ ডিগ্রি সমাপ্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন।

সারাজীবনের বড়ো একটি অংশ কারাবাস এবং কারাজীবন ভোগও মুজিবকে আইন পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। শেখ মুজিব প্রথম কারাজীবনের অভিজ্ঞতা লাভের সম্মুখীন হন মাত্র ১৯ বছর বয়সে, ১৯৩৯ সালে। ঘটনাটি ছিল– সে বছর গোপালগঞ্জে একটি মেলার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষ মিলে সম্মিলিতভাবে মেলার আয়োজন করে। মেলা চলাকালীন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহ সৃষ্টি হয়। কলহ দাঙ্গায় রূপ নেয়। খবর পেয়ে মুজিব সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে দাঁড়ালেন দাঙ্গা থামাতে। দাঙ্গা থামল বটে তবে কিছু হিন্দু নেতৃস্থানীয় লোকের স্বার্থের হানি হওয়াতে তারা মুজিবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। মুজিবকে শায়েস্তা করতে হবে, এই 'পুচকে' নেতার উচিত শিক্ষা দিতে হবে। তার উপর আবার এ পুচকে 'যবনের ছেলে'। কিছুতেই ছাড়া যাবে না একে। এর মাথা এখনই কচলে দিতে হবে। হিন্দু নেতারা থানায় গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে এজহার দায়ের করল মেলায় ভাঙচুর এবং আর্থিক ক্ষতিসাধনের অভিযোগে। এজহার দায়ের করেই ক্ষান্ত হয়নি, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করিয়ে সেই রাতেই মুজিবকে গ্রেপ্তার করানো হলো। যদিও শেখ মুজিব জীবনের প্রথম থেকেই ছিলেন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন একজন মানুষ। বিচারে শেখ মুজিবের ৭ দিন বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হলো। জীবনে প্রথম তিনি কারাবাস যাপন করলেন। তবে শেখ মুজিবের এই ঘটনা থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ফুঠে উঠেছে যে, শৈশব-কৈশোর থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়ের উল্লেখযোগ্য অংশ কাটাতে হয়েছিল কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে-নির্জন সেলে। কথিত রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বক্তব্য প্রদান, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনের চেষ্টাসহ বিভিন্ন হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলায়, দি বেঙ্গল স্পেশাল পাওয়ার অর্ডিন্যান্স, ১৯৪৬–যা পরবর্তীতে অস্থায়ীভাবে পুনঃপ্রবর্তন ও ধারাবাহিকতা দেওয়া হয় দি ইস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট ১৯৫১ নামে। দি ইস্ট পাকিস্তান পাবলিক সেফটি অর্ডিন্যান্স ১৯৫৮ এবং ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস ১৯৬৫ যেগুলো 'পাকিস্তানের নিরাপত্তা' নামে অধিক পরিচিত ছিল। এসব আইনের আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বারংবার পাকিস্তান সরকার গ্রেপ্তার ও আটক করে রাখে। আদালতের আদেশে এক মামলায় মুক্তি পেলে জেলগেটেই আরেক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আটক রাখে। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় তাঁকে তেমনই গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের এবং বিচার করার জন্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের সরকার ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান প্যানাল কোডের ১২১(ক) ধারা এবং ১৩১ ধারা অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি দায়ের করে এবং আগে থেকে আটককৃত শেখ মুজিবকে এই মামলায় নতুনভাবে আটক দেখিয়ে জেলে ভরে রাখা হয়। আপোশহীন সংগ্রামী বঙ্গবন্ধু সেসব

পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন অদম্য সাহস আর জনগণের ওপর গভীর আস্থা রেখে।

শেখ মুজিবের ছিল অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা ও ক্ষমতা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া। শৈশবের এসব ঘটনা শেখ মুজিবকে আইন আদালতের প্রতি কৌতূহল করে তোলে। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ পাস করে দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন ১৯৪৮ সালে।

১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলন, ধর্মঘট এবং কর্মবিরতিতে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সাথে শেখ মুজিবকেও অর্থ জরিমানা করে।

অনেকে জরিমানা পরিশোধ করে ছাত্রত্ব বজায় রাখেন কিন্তু শেখ মুজিব 'অন্যায় জরিমানা' দিতে অস্বীকার করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের পেছনে সরকারের কারসাজি ছিল, ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রতি শেখ মুজিবের সমর্থন এবং কার্যক্রম গ্রহণের প্রতিশোধ হিসেবে। এভাবেই শেখ মুজিবের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত হয়।

তারপর সারা জীবন কাটে আন্দোলন-সংগ্রামে, কারাবাসের জীবনে আইন-আদালতে আইনজীবীদের সাহচর্য। তাইতো মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষমতা গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি বিভিন্ন নির্বতনমূলক এবং নির্যাতনমূলক আইনের সংশোধনী এনে জনজীবনের প্রয়োজনীয় নতুন নতুন আইন জারি করলেন।

১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর নিজের স্বাক্ষরিত ৪০টি আইন পাস হয় সংসদ কর্তৃক। তার আগে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বেশ কিছু আইন পাস হয় জনকল্যাণমূলক এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় আইন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু দেশে প্রত্যাবর্তনের পর এবং রাষ্ট্রভার গ্রহণ করার পর তাঁর শাসনামলে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দেশে মোট ২৫২টি পি.ও (প্রেসিডেন্ট অর্ডার), আইন (অপঃ) অধ্যাদেশ, অর্ডিন্যান্স জারি হয়।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে পৌঁছার আগ পর্যন্ত এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণের পর সদ্য স্বাধীন দেশ পরিচালনার জন্য মোট ৩৬টি P.O বা প্রেসিডেন্ট অর্ডার জারি করা হয়। ১৯৭৩ সালে ৩৪টি অ্যাক্ট বা আইন এবং ৩৩টি অধ্যাদেশ বা অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। ১৯৭৪ সালে ৫৩টি অ্যাক্ট, ৯টি অধ্যাদেশ বা অর্ডিন্যান্স এবং ১৯৭৫ সালে ৩৭টি অ্যাক্ট বা আইন, ৫০টি অধ্যাদেশ বা অর্ডিন্যান্স জারি হয়। তার মধ্যে ৪০টি আইনে শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রধান বা প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজে স্বাক্ষর করেন।

সারা জীবন বঙ্গবন্ধু আইনের প্রতি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। যেটা আমরা দেখি একাত্তরের পয়লা মার্চের পরবর্তী সময়ের সেই উত্তাল দিনগুলোতেও তিনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই আমরা ৭ই মার্চের ভাষণে। সাড়ে সাত কোটি স্বাধীনতার বাঙালি সেদিন তাঁর ডাকটিরই অপেক্ষায় উন্মুখ হয়েছিল। এত চাপের মধ্যেও বঙ্গবন্ধু ধীরস্থির ছিলেন। আইন অমান্য করেননি সেদিনও। আইন অমান্যের ডাকও দেননি। বলেছেন, 'তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো'। তিনি ভাষণে কী দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। আইন অমান্যও করেননি আবার জনগণের প্রত্যাশাকেও সামাল দিয়েছেন 'ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো'-র ডাক দিয়ে।

আইন-আদালত, জেল-জরিমানা বঙ্গবন্ধুর জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। প্রায় ৫৫ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি জেল খেটেছেন। বিভিন্ন মামলায় তাঁকে জীবনের দীর্ঘ সময় কোর্ট-কাচারির দরজায় হাজিরা দিতে হয়েছে। মামলামোকদ্দমা পরিচালনার জন্যে আইনজীবীদের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ছিল এমনই ব্যক্তিত্ব যার কারণে দেশের বিশিষ্ট আইনজীবীরা তাঁর বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু।

---

*লেখক : আইনজীবী, সাহিত্যিক, গবেষক ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ*

## বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর ২য় আলোকচিত্র প্রদর্শনী

'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর চার দিনব্যাপী ২য় আলোকচিত্র প্রদর্শনী ৩রা আগস্ট সিউলে শুরু হয়। সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে এবং ইয়াংওয়ান কর্পোরেশনের সহযোগিতায় উক্ত কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম এবং ইয়াংওয়ান কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সাং কি-হাক প্রদর্শনীটির উদ্‌বোধন করেন। উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রথম আলোকচিত্র প্রদর্শনীটি ৯-১৩ই জুলাই সিউল শহরের প্রাণকেন্দ্র গাংনামের থিও গ্যালারিতে কোরিয়ান কালচার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আয়োজন করা হয়।

রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতির পিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অবদানের প্রতি আলোকপাত করে তিনি বলেন, প্রদর্শনীর আলোকচিত্রগুলোতেও তাঁর সেই সুবিশাল কর্মযজ্ঞ প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এই প্রদর্শনী দক্ষিণ কোরিয়ার বন্ধুপ্রতিম জনগণকে তথা তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর এবং তাঁর রূপকল্প, দর্শন ও মতাদর্শ সম্পর্কে জানতে অনুপ্রাণিত করবে।

পরবর্তীতে, রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম চেয়ারম্যান সাং কি-হাককে বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-র কোরিয়ান সংস্করণ উপহার প্রদান করেন। উল্লেখ্য, সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ১লা জুলাই ২০২১ এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রকাশনাটির মোড়ক উন্মোচন করে।

**প্রতিবেদন : নওশান আহমেদ**

# বঙ্গবন্ধু ও যুবসমাজ

## সুস্মিতা চৌধুরী

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বয়স এখন পঞ্চাশ। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ সব খাতেই সাফল্য দেখিয়েছে বিশ্ব দরবারে। বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর বুকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এই এগিয়ে যাবার পেছনে অন্যতম প্রধান শক্তি হচ্ছে যুবসমাজ। যুবসমাজকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে ঈর্ষণীয় এই অগ্রগতির মূলমন্ত্র শিখিয়েছেন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালে ১১ দফা, ১৯৬৯ সালে গণ–অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালে নির্বাচন ও পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এদেশের যুবসমাজ রেখেছে আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত– যা দেশ ও জাতির গর্ব।

যুবসমাজের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু মিশে আছেন, থাকবেন। বর্তমান যুবসমাজ বঙ্গবন্ধুর অসীম সাহসিকতা, অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলি, প্রজ্ঞা আর দূরদর্শিতায় দীক্ষিত। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। আর এই এগিয়ে চলায় বাংলা ও বাঙালিকে উদ্দীপিত করেছে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু যে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বার বার বলেছেন, আজ আমরা সেই মুক্তি অর্জনের পথে। বঙ্গবন্ধু প্রায় বক্তব্যে বলতেন, 'দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হলে বেকার সমস্যা এবং সম্ভাবনা দুটিই যুবসমাজের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। যুবসমাজ বেকার থাকলে তারা বিপদগ্রস্ত হয়, দেশের জন্য ক্ষতিকর বোঝায় পরিণত হয়। আর কোনো দেশের যুবসমাজ যদি কর্মঠ হয় এবং কাজের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ পায়, তাহলে ঐ দেশের দ্রুত উন্নতি কেউ আটকাতে পারে না। যুবসমাজের বুদ্ধি, মেধা এবং সতেজ জ্ঞানের গতি এই সবুজ-শ্যামল বাংলাকে প্রকৃত সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে পারে।'

স্বাধীনতার আগেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার যুবসমাজের মুক্তির কথা চিন্তা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের বড়ো অধ্যায়ও যুব বয়সের। বাংলা ভাষা সংগ্রামীরা ছিলেন ছাত্র, যুবক, তরুণ। বাংলা ভাষার ওপর আঘাতে ১৯৪৮ সালে প্রতিবাদী মুজিবও ছিলেন যুবক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলা ভাষার বিলয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে শিক্ষা ব্যবস্থা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশপ্রেমী যুবকরাই বাংলার সংশয়–সংকটে ছিনিয়ে এনেছে উজ্জ্বল আলোর দিশা।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের বড়ো অংশ ছিল তরুণ–যুবসমাজ। ১৯৫৩ সালে ৩৩ বছরের টগবগে বাঙালি যুবক শেখ মুজিবুর রহমানই হয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, '... এবং দেশের প্রায় শতকরা সত্তরটা ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হলাম। যুবক কর্মীরা আমার দিকে ঝুঁকে পড়লো। কারণ আমিও তখন যুবক ছিলাম।'

বঙ্গবন্ধুর সব ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি। তাঁর যুবসমাজ ভাবনার গভীরেও রয়েছে বাঙালির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তি ও বিশ্ব রাষ্ট্রে বাঙালির মাথা উঁচু করে নেতৃত্ব দেওয়ার দর্শন। বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'আজকের যুবকরাই আগামীকাল দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।'

১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে দেশবাসীর উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হইতে পারে না। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।' ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশেই শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল। সদ্য যুদ্ধজয়ী রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রথম বাজেটে বঙ্গবন্ধু প্রতিরক্ষা খাতের চেয়ে শিক্ষা খাতে বেশি বরাদ্দ রেখেছিলেন। আগামী প্রজন্মের যুবসমাজকে গড়ে তুলতে তিনি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

বাংলার যুবসমাজ যেন নিজেকে দক্ষ ও কর্মমুখী করতে পারে, দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে, বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে সে কামনা করতেন। যুবসমাজের উদ্দেশে তিনি বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশনামূলক বক্তৃতা-বিবৃতি দিতেন। ১৯৭৩ সালের ১৯শে আগস্ট যুবক ও ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'বাবারা একটু লেখাপড়া শিখ। যতই জিন্দাবাদ আর মুর্দাবাদ করো, ঠিকমতো লেখাপড়া না শিখলে কোনো লাভ নেই। আর লেখাপড়া শিখে যে সময়টুকু পাবে বাপ-মাকে সাহায্য করো। প্যান্ট পড়া শিখছ বলে বাবার সাথে হাল ধরতে লজ্জা করো না। ... গ্রামে গ্রামে বাড়ির পাশে বেগুন গাছ লাগিও, কয়টা মরিচ গাছ লাগিও, কয়টা লাউ গাছ ও কয়টা নারিকেলের চারা লাগিও। বাপ-মাকে একটু সাহায্য করো। শুধু বিএ-এমএ পাস করে লাভ নেই। ... বুনিয়াদি শিক্ষা নিলে কাজ করে খেয়ে বাঁচতে পারবে।'

যুবসমাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ করার দায়িত্ব শুধু মন্ত্রী বা সদস্যদের নহে। এ ব্যাপারে

*যুবকদের মাঝে নির্বাচনি প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু*

যুবসমাজকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।' স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যুবসমাজের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সালে তিনি বলেছিলেন, 'ওয়াদা কর দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবি।'

যুবসমাজের কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অনুপ্রেরণার নাম। তিনি যুবসমাজের কাছে একাধারে জীবন সংগ্রামের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ও আদর্শের প্রতীক; অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কারিগর, উদার ব্যক্তিত্ব, সফল রাজনীতিবিদ। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তারই প্রমাণ বহন করে। ৭ই মার্চের ভাষণের ধারাবাহিকতায় গোটা বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন স্লোগান ছিল একটাই– 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। তাই বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে হাজারো যুবক তাদের বুকের তাজা রক্ত উৎসর্গ করেছিল স্বাধীনতার জন্য। যুবকদের সেই আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয়। বাংলাদেশের যুবসমাজ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ অবদান ও মহান আত্মত্যাগ চির অম্লান হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের পুরো ভাষণটি ঐতিহাসিক বর্ণনায় বিস্তৃত এবং বঙ্গবন্ধু যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে যুবসমাজের কাছে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ও তার থেকে শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেছেন। বঙ্গবন্ধু ছাত্রদের দেশ গড়ার সংগ্রামের কথা বলেছেন। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণটি থেকে শিক্ষা নিয়ে যুবসমাজকে দেশের সার্বিক কল্যাণে চিন্তা-চেতনা আরো সমৃদ্ধ করতে হবে। বঙ্গবন্ধু ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে তাঁর এক বাণীতে বলেছেন, 'আমাদের সবকিছুই আজকে নতুন করে গড়তে হবে। সেজন্য আজকে আমাদের বাংলার যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলার কৃষক, ছাত্রকে এগিয়ে আসতে হবে, বাংলার মজদুরকে এগিয়ে আসতে হবে, বাংলার বুদ্ধিজীবীকে এগিয়ে আসতে হবে।'

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুবসমাজ। আমাদের দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তর ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জন করতে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এটাই জাতির প্রত্যাশা ও কামনা।

*লেখক : প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক*

## সুইডেন বাংলাদেশ দূতাবাসে 'আলোকচিত্রে বঙ্গবন্ধু'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের বাংলাদেশ দূতাবাসে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী 'আলোকচিত্রে বঙ্গবন্ধু'-এর উদ্‌বোধন হয়। সুইডেন নিবাসী বঙ্গবন্ধু অনুরাগী মোহাম্মদ আফতাবুর রহমানের সংগৃহীত এবং মুদ্রিত জাতির পিতার পারিবারিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দুর্লভ ছবি এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে। রাষ্ট্রদূত মো. নাজমুল ইসলাম প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন।

এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বঙ্গবন্ধুর জীবনী, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং বিভিন্ন অর্জন নিয়ে বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম এবং চেতনা প্রবাসীসহ সকল বাঙালিদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে সকলকে হাতে হাত রেখে।

মুজিববর্ষকে উপজীব্য করে দূতাবাসের বিভিন্ন কার্যক্রমগুলো তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত বলেন, এই আলোকচিত্র প্রদর্শনী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য স্মৃতিসমূহ ও তাঁর আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামী জীবনকে মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

উল্লেখ্য, দুই সপ্তাহব্যাপী এ আলোকচিত্র প্রদর্শনী ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত দূতাবাস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীটি সকলের জন্য উন্মুক্ত।

**প্রতিবেদন : কুমার দেব**

*বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২১ প্রদান' অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ৮ই আগস্ট ২০২১ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা– পিআইডি*

# বঙ্গমাতার ৯১তম জন্মবার্ষিকী জাতীয়ভাবে পালন

শোকাবহ আগস্ট বাঙালির জাতীয় জীবনে এক বেদনাবিধুর মাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে বাঙালি জাতি হারিয়েছে সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বঙ্গমাতাও এই ঘৃণ্য নরঘাতকদের হাতেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গেই নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেন। বেদনার এ মাসেই বঙ্গমাতা ১৯৩০ সালের ৮ই আগস্ট তৎকালীন গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাকনাম ছিল রেণু। বাঙালি এই শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে এক মহীয়সী নারীর ত্যাগ ও দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে এই প্রথমবার বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। কেননা বাংলাদেশের রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিসংগ্রাম, স্বাধীনতা অর্জন ও রাষ্ট্রগঠনে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তাঁর এই প্রেরণার মূলে রয়েছেন তাঁর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব রেণু। তিনি শক্তহাতে পরিবার সামলিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সাংগঠনিক কাজে সহায়তা করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গমাতার অবদান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ৮ই আগস্ট নানা কর্মসূচিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় আলোচনাসভা, দোয়া মাহফিল এবং অসহায় দরিদ্রদের মাঝে সেলাই মেশিন ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। এ দিবসে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো রাজধানীর বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি আলোচনাসভা, ওয়েবিনার, মিলাদ, খাদ্য বিতরণসহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করে। দেশের বাইরেও নানা কর্মসূচি পালিত হয়।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে বলেন,

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমি এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে প্রথমবারের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পাঁচজন বিশিষ্ট নারীকে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক প্রদান একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকীর প্রতিপাদ্য– 'বঙ্গমাতা সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক সহযাত্রী', অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।...

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী হওয়ার পর তাঁর জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি কেবল জাতির পিতার সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত। দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুকে অসংখ্যবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব সেই কঠিন দিনগুলো দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করেছেন। পরিবারের দেখাশোনার পাশাপাশি স্বামীর মুক্তির জন্য মামলা পরিচালনা, দলের সাংগঠনিক কাজে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান সবই তাঁকে করতে হয়েছে। তিনি সংগঠনের নেতা-কর্মী ও গরিব আত্মীয়স্বজনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাসহ অর্থনৈতিক সংকটে মুক্তহস্তে দান করতেন। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও ছিলেন তিনি। তাঁরই পরামর্শে বঙ্গবন্ধু হৃদয় থেকে উৎসারিত অলিখিত এ ভাষণ প্রদান করেন। দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতা তাঁকে বঙ্গমাতায় অভিষিক্ত করেছে। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব বাঙালির অহংকার, নারীসমাজের প্রেরণার উৎস।

বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে তাঁকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কার মাঝেও তিনি অসীম ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।...

আমি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাণীতে বলেন,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকীর এবারের প্রতিপাদ্য– 'বঙ্গমাতা সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক সহযাত্রী' যথার্থ হয়েছে; যেখানে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সর্বক্ষণের সহযোগী ও অনুপ্রেরণাদায়ী এই মহীয়সী নারীর কর্মময় জীবনের প্রকৃত অর্থ প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।...

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী ফজিলাতুন নেছা মুজিব আমৃত্যু স্বামীর পাশে থেকে একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে দেশ ও জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি জাতির পিতার সঙ্গে একই স্বপ্ন

*তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৮ই আগস্ট ২০২১ তথ্য ভবন মিলনায়তনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি*

দেখতেন। এদেশের মানুষ সুন্দর জীবন পাক, ভালোভাবে বাঁচুক এই প্রত্যাশা নিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সবসময় ছিলেন সজাগ এবং দূরদর্শী। তাইতো একজন সাধারণ বাঙালি নারীর মতো স্বামী-সংসার, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সাফল্যে বঙ্গমাতা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। জাতির পিতা রাজনৈতিক কারণে প্রায়ই কারাগারে বন্দি থাকতেন। এই দুঃসহ সময়ে তিনি হিমালয়ের মতো অবিচল থেকে একদিকে স্বামীর কারামুক্তিসহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন; অন্যদিকে সংসার, সন্তানদের লালন-পালন, শিক্ষাদান, বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস জুগিয়ে স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রামকে সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ছয় দফা ও ১১ দফার আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ অবদান রাখেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গৃহবন্দি থেকে এবং পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা সত্ত্বেও তিনি সীমাহীন ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে নির্যাতিত মা-বোনদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং সামাজিকভাবে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেন। দেশ ও জাতির জন্য তাঁর অপরিসীম ত্যাগ, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতার কারণে জাতি তাঁকে যথার্থই 'বঙ্গমাতা' উপাধিতে ভূষিত করেছে।...

আমি বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

৮ই আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করে প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, সংসার সামলাবার পাশাপাশি জাতির পিতার অনেক সময়োচিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বঙ্গমাতার পরামর্শ আন্দোলন সংগ্রামে গতির সঞ্চার করেছিল। জাতির পিতার সহধর্মিণী হিসেবে বঙ্গমাতা এক হাতে যেমন সংসার সামলেছেন তেমনি অনেক সময়োচিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করেছেন।...

শেখ হাসিনা বলেন, কিন্তু কখনো রাজনৈতিক নেতা হতে হবে, রাজনীতি করে কিছু পেতে হবে সে চিন্তা তাঁর (বঙ্গমাতার) ছিল না। কোনো সম্পদের প্রতিও তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। এভাবেই নিজের জীবনকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন।

আর সবশেষে আপনারা দেখেছেন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার মা খুনিদের কাছে নিজের জীবন ভিক্ষা চান নাই। তিনি নিজে জীবন দিয়ে গেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার সিঁড়িতে পড়ে থাকা মৃতদেহ দেখে সোজা বলে দিয়েছেন, 'তোমরা ওনাকে মেরেছ, আমাকেও মেরে ফেল।' খুনিরা বলেছিল আমাদের সঙ্গে চলেন, 'তোমাদের সঙ্গে আমি যাব না তোমরা এখানেই আমাকে খুন কর,' খুনিদের বলে দেন তিনি।

'ঘাতকের বন্দুক গর্জে উঠেছিল, সেখানেই আমার মা'কে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। কতটা সাহস একটা মানুষের মনে থাকলে সে মানুষটা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবন ভিক্ষা না নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারেন। আজকে আমাদের দেশের নারীসমাজ যে একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছে সেখানে আমি মনে করি আমার মায়ের এই কাহিনি শুনলে অনেকেই অনুপ্রেরণা পাবে। শক্তি ও সাহস পাবে দেশের জন্য, জাতির মঙ্গলে কাজ করতে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব সায়েদুল ইসলাম স্বাগত ভাষণ দেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পদক বিজয়ীদের হাতে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২১' তুলে দেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া, সমাজসেবা, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ, গবেষণা, কৃষি ও পল্লি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য এ বছর পাঁচজন বাংলাদেশি নারীকে এই পদক প্রদান করা হয়েছে।

প্রথমবারের মতো অন্তর্ভুক্ত 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব' পদকটি এবার থেকে নারীদের জন্য 'ক' শ্রেণিভুক্ত সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক হিসেবে গণ্য হবে। পুরস্কার হিসেবে ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের ৪০ গ্রাম ওজনের একটি পদক, ৪ লাখ টাকার চেক, সার্টিফিকেট এবং উত্তরীয় প্রদান করা হয়।

পুরস্কার বিজয়ীরা হচ্ছেন– বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মমতাজ বেগম (মরণোত্তর), জয়াপতি (মরণোত্তর), মোসাম্মৎ নুরুন্নাহার বেগম, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ জোবেদা খাতুন পারুল এবং নাদিরা জাহান (সুরমা জাহিদ)।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান চেমন আরা তৈয়ব মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন। এছাড়া পদক বিজয়ীদের পক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ জোবেদা খাতুন পারুল নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তৃতা করেন।

নারীদের আর্থিক সাহায্য ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বঙ্গমাতার

৯১তম জন্মবার্ষিকীতে দেশের সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের তালিকা অনুযায়ী ৬৪ জেলার চার হাজার অসচ্ছল নারীকে সেলাই মেশিন ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে দুই হাজার নারীকে দুই হাজার টাকা করে মোট ৪০ লাখ নগদ টাকা ও সেলাই মেশিন বিতরণ কার্যক্রমও গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

৮ই আগস্ট রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবন মিলনায়তনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের তিন সংস্থা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ও চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড আয়োজিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনাসভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, খুনিচক্র বঙ্গবন্ধুর ছায়াকেও ভয় পেত বলেই জাতির পিতার পরিবার-পরিজনকে হত্যা করেছে এবং সেই খুনিদের পৃষ্ঠপোষকেরাও বঙ্গবন্ধুর ছায়াকে ভয় পায়। তাই তারা বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করে, অস্বীকার করার অপচেষ্টা চালায়।

যারা বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করেছে, খলনায়ককে নায়ক বানানোর অপচেষ্টা চালিয়ে এসেছে, আস্তে আস্তে তারাই ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাচ্ছে, মানুষ সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে।

তিনি বলেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব আজীবন বঙ্গবন্ধুর ছায়ার মতো সঙ্গী ছিলেন, মরণেও তিনি সঙ্গী হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর যখন ঘাতকের দল যে কামরার মধ্যে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা ছিলেন সেখানে হাজির হন, তখন তিনি নিজেই বলেছিলেন তোমরা তাঁকে মেরেছ আমাকে এখানেই মেরে ফেল। এই বলেই তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

মানুষের সাফল্যের পেছনে জীবনসাথির একটি বড়ো ভূমিকা থাকে, যা ছাড়া মানুষের পক্ষে সফল হওয়া কঠিন আর বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে সেটি আরো বেশি সত্য ছিল, উল্লেখ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বলেন, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণীই ছিলেন না, নিকটতম প্রাজ্ঞসহকর্মী ও সবচেয়ে বড়ো প্রেরণাদাত্রী। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ পরিচালিত হচ্ছে বলেই আজ আমরা বঙ্গমাতার জন্মদিন পালন করতে পারছি, আগে তা সম্ভব হয়নি।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সারা জীবন ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য ও সংগ্রামের যে নজির বঙ্গমাতা স্থাপন করেছেন ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে এসময় আরও বক্তব্য রাখেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া এবং চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মো. জসীম উদ্দিন। অনুষ্ঠানের শুরুতে 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবন ও কর্ম' শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ৮ই আগস্ট ঢাকা থেকে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ আয়োজিত মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা'র ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতির পিতার নেপথ্য শক্তি, সাহস ও বিচক্ষণ পরামর্শক ছিলেন বঙ্গমাতা। তিনি রাজনীতির সাথে জড়িত না থেকেও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সাফল্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের সঞ্চালনায় এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন– বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক সম্পাদক শাম্মী আহমেদ, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ট্রাস্টি ফরিদা শেখ জলি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি নাসরীন আহমেদ শিলু। প্রধান আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট লেখক, কলামিস্ট, সাহিত্যিক আবদুল গাফফার চৌধুরী। বক্তারা তাদের আলোচনায় বঙ্গমাতার বর্ণাঢ্য ও গৌরবময় কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

এছাড়া বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল। গ্রিস, জর্ডান, স্পেন, কলকাতা, ভিয়েতনাম, চীনের কুনমিং ও জাপানসহ বিভিন্ন দেশেও তাঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

৮ই আগস্ট ২০২১ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির উদ্যোগে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে পর্দার অন্তরালে থেকে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়েছেন বঙ্গমাতা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে ছায়ার মতো থেকে শক্তি জুগিয়েছেন। জাতির পিতার দীর্ঘ সংগ্রামে অনন্য ভূমিকার জন্য তিনি ক্রমেই পরিণত হন বঙ্গমাতায়। বঙ্গমাতার আদর্শ আমাদের এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর জন্মবার্ষিকী রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হওয়ায় তাঁর কর্মজীবন যেমন আমরা সকলে জানতে পারব, তেমনি তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হব– এই প্রত্যাশা করি।

*সচিত্র বাংলাদেশ ডেস্ক প্রতিবেদন*

# সায়মন ড্রিং: ভুলবে না তোমায় বাংলাদেশ

## কাজী সালমা সুলতানা

বাঙালির জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড়ো অর্জন মহান স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম করতে হয়েছে। সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ করতে হয়েছে নয় মাস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তেইশ বছর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এদেশের বাঙালিদের অধিকার আদায়ে জাগ্রত করেন। তারই ধরাবাহিকতায় ত্রিশ লাখ শহিদের রক্ত আর দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অর্জনে আমরা যেমন রক্ত দিয়েছি, তেমনি আমাদের ন্যায়সংগত দাবি আদায়ে বিশ্ববাসীও পাশে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে জীবন রক্ষা করতে প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধকালে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা প্রদান করে। এছাড়া বেশ কয়েকটি দেশ এবং বিশ্বের অনেক বিবেকবান মানুষ মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে। মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাশে দাঁড়ানো বন্ধুরাষ্ট্র ও বিশিষ্টজনদের প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে বাংলাদেশ। তেমনি একজন বিশিষ্টজন সাংবাদিক সায়মন ড্রিং।

সাংবাদিক সায়মন ড্রিং পেশাগত দায়িত্ব পালনের মাঝেই বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হন। মহান মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বিদেশি বন্ধু, বড়ো আপনজন সায়মন ড্রিং। সাংবাদিক, টেলিভিশন উপস্থাপক, তথ্যচিত্র নির্মাতা সাইমন ড্রিং পেশাগত দায়িত্ব থেকে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ান। একাত্তরে লন্ডনের *দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকার প্রতিবেদক সাইমন ড্রিং কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে কাজ করতেন। লন্ডনের সদর দপ্তর থেকে ফোন করে তাঁকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান যেতে বলা হয়। সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত। বড়ো কিছু ঘটতে যাচ্ছে, 'তুমি ঢাকা যাও'। সাইমন অনেক বছর ধরে সাংবাদিকতা করছিলেন। বেশ কয়েক বছর ধরেই সাংবাদিকতা করছিলেন লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম অঞ্চলে। কিন্তু পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। তবু তিনি ৬ই মার্চ কম্বোডিয়া থেকে ঢাকায় চলে আসেন।

ঢাকায় এসে সাইমন ড্রিং ওঠেন শাহবাগের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। পরদিনই তাঁর সুযোগ হয় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের সময় উপস্থিত থাকার। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ তিনি কভার করেন। পরে তাঁর সখ্য হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে। এই ঐতিহাসিক ভাষণ নিয়ে সাইমন বলেন, 'ভাষণ আমি বুঝিনি, কিন্তু শেখ মুজিবের দৃঢ়তা আর তাঁর প্রতি লাখ লাখ মানুষের আস্থা দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম'। জাত সাংবাদিক সাইমন বলতেন, "সেই ভাষণ, সেই জনসভা এবং পাকিস্তান সরকারের নানা পদক্ষেপ দেখে আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম, 'ইট উইল বি আ ব্যাটেল গ্রাউন্ড', এখানে নতুন ইতিহাস রচিত হতে যাচ্ছে।" সাংবাদিক হিসেবে এসময়ে এই মাঠে থাকার চেয়ে আর ভালো কিছু হতে পারে না। তাই লন্ডনে অফিসকে জানিয়ে দেন, তিনি ঢাকা ছাড়ছেন না।

এদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী প্রস্তুতি নিতে থাকে অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়নের। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরুর আগেই ঢাকায় অবস্থানরত সব বিদেশি সাংবাদিককে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবরুদ্ধ করে রাখে। সাংবাদিকদের জানানো হয় যে, শহরের পরিস্থিতি খুব খারাপ, নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের হোটেলের ভেতরেই অবস্থান করতে হবে। তাদের হোটেলে অবরুদ্ধ রেখে ঘটানো হয় অপারেশন সার্চলাইট। কিন্তু রাতের আঁধারে যে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, তা তো আর মুহূর্তেই মুছে ফেলার নয়। তাই এই সংবাদ যাতে বিশ্ববাসী জানতে না পারে সেজন্য পরদিন সকালে ৪০ জন সাংবাদিককে ঢাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তাদের হোটেল থেকে সরাসরি বিমানবন্দরে নিয়ে বিমানে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ সাইমন ড্রিংকে খুঁজে পায়নি। এসময় সায়মন ড্রিং বুঝতে পারেন যে, ঢাকায় বড়ো ধরনের কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তিনি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হোটেলেই লুকিয়ে ছিলেন। পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের ফাঁকি দিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ছাঁদের পানির ট্যাংক, বার, লবি, কিচেন প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৩২ ঘণ্টা লুকিয়ে থাকেন।

২৭শে মার্চ সকালে কারফিউ উঠে গেলে সায়মন ড্রিং হোটেলের কর্মচারীদের সহযোগিতায় ছোট্ট একটি মোটরভ্যানে করে ঘুরে ঘুরে দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল), রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক, পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকা, ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধুর বাড়িসহ বিভিন্ন জায়গা। গণহত্যার ছবিসহ প্রকাশ করেন 'ট্যাংকস ক্রাশ রিভল্ট ইন পাকিস্তান'। ঢাকায় দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর চালানো প্রথম দফার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রত্যক্ষ চিত্র ফুটে ওঠে এ প্রতিবেদনে। লন্ডনের *দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় ৩০শে মার্চ তা প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদন থেকেই বিশ্ববাসী জানতে পারে পাকিস্তানি বাহিনীর সেদিনের বর্বরতার কথা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত সঞ্চারে এ প্রতিবেদন বিশেষ ভূমিকা রাখে। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে লুকিয়ে থাকা, পরদিন পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার চিত্র প্রত্যক্ষ করা একমাত্র বিদেশি সাংবাদিক সাইমন ড্রিং। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁর

সহযোগী ক্যামেরাম্যানসহ তাঁকে ২৭শে মার্চ পাকিস্তান থেকে বের করে দেয়। কিন্তু সাইমন তাঁর নোটবুক ক্যামেরাম্যান আর ছবির রিল লুকিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হন।



TANKS CRUSH REVOLT IN PAKISTAN

7,000 slaughtered: Homes burned

By SIMON DRING in Bangkok, who was in Dacca during the fighting

IN the name of "God and a united Pakistan," Dacca is today a crushed and frightened city. After 24 hours of ruthless, cold-blooded shelling by the Pakistan Army, as many as 7,000 people

পরবর্তীতে আবারো ঢাকায় এলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে জোরপূর্বক দেশ থেকে বের করে দেয়। তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে যান এবং পুনরায় ১৯৭১ সালের নভেম্বরে কলকাতায় পৌঁছান। সেখান থেকে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় খবর সংগ্রহ করে সংবাদ প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কভার করেন যুদ্ধের মাঠ থেকে। এসময় কয়েকজন সাংবাদিকসহ সাইমনকে কলকাতায় আটকও হতে হয়। মার্চে পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত সাইমন ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের দিন তিনি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে ট্যাংকে চড়ে ময়মনসিংহ হয়ে প্রবেশ করেন মুক্ত বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। ফিরে আসেন স্বাধীন বাংলাদেশে, বিজয়ের খবর কভার করে ফিরে যান লন্ডনে। আবার আসেন ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি, যেদিন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে আসেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর গভীর শোকে আচ্ছন্ন ছিলেন সাইমন।

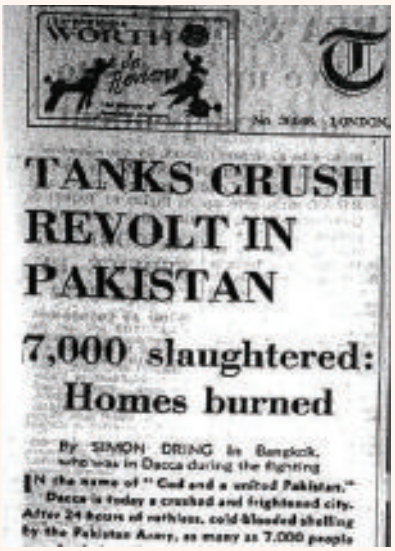

বৈদেশিক সংবাদদাতা, টেলিভিশন উপস্থাপক এবং তথ্যচিত্র নির্মাতা হিসেবে সাংবাদিক সাইমন ড্রিং প্রখ্যাত সংবাদ সংস্থা রয়টার্স, টেলিগ্রাফ ও বিবিসির হয়ে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। সাইমন ড্রিং *দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ* এবং বিবিসি টেলিভিশন নিউজের বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করেছেন।

সাইমন ড্রিং ১৯৪৫ সালের ১১ই জানুয়ারি ইংল্যান্ডের ছোট্ট শহর নরফোকের ফাকেনহ্যামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়স থেকে তিনি সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর দেখার অভিজ্ঞতা বিপুল সমৃদ্ধ। তিনি দেখেছেন ২২টি যুদ্ধ, অভ্যুত্থান ও বিপ্লব। সাইমন ড্রিং *দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ* এবং বিবিসি টেলিভিশন নিউজের বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের গণহত্যার ওপর প্রতিবেদন করে খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেন।



সায়মন ড্রিং ১৯৯৭ সালে বিবিসি ছেড়ে বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল একুশে টেলিভিশনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যুক্ত হন। তাঁর হাত ধরেই বাংলাদেশে টেলিভিশন সাংবাদিকতা নতুন মাত্রা পায়। এ কারণে তাঁকে বাংলাদেশে তো বটেই, বলা হয় এ উপমহাদেশের ব্রডকাস্ট সাংবাদিকতার জনক। ২০০২ সালে তৎকালীন জামায়াত-বিএনপির নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার একুশে টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম বন্ধ করলে সায়মন ড্রিং বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। অবশ্য এরপরও বেশ কয়েকবার তিনি এদেশে এসেছেন।

সাইমন ড্রিং কেবল সাংবাদিকতার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেননি। বিশ্বের সর্ববৃহৎ দাতব্য তহবিল 'দ্য রেস এসেইন্ট টাইম' তাঁর হাতেই গড়া। বিশ্বের ১৬০টি দেশের সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ স্বেচ্ছায় অর্থ দিয়েছেন এ প্রতিষ্ঠানে। 'স্পোর্ট এইড' নামে তাঁর আরেকটি তহবিল ছিল। বিশ্বের ১২০টি দেশের প্রায় দুই কোটি মানুষ এ তহবিলে দান করেছিলেন। এ তহবিলের অর্থ ব্যয় করা হয় আফ্রিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দখলদার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে অর্জন করেন ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টার অব দ্য ইয়ার, ইরিত্রিয়া যুদ্ধের ওপর ভ্যালিয়ান্ট ফর ট্রুথ, কুর্দিদের বিরুদ্ধে তুরস্কের যুদ্ধের প্রতিবেদনের জন্য সনি এবং হাইতিতে আমেরিকান আগ্রাসনের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে নিউইয়র্ক ফেস্টিভ্যাল গ্র্যান্ড প্রাইজ পুরস্কার অর্জন করেন। ২০১২ সালের মার্চে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'মুক্তিযুদ্ধের সম্মাননা ও মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা'য় ভূষিত করে। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সাইমন ড্রিং আশির দশকের শুরুর দিকে বিবিসি ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে সিনেমা প্রযোজনার কোম্পানি গঠন করেন। সেখান থেকে বিবিসি ও পাবলিক ব্রডকাস্ট সার্ভিসের জন্য নির্মাণ করেন বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্র। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও লাতিন আমেরিকার ওপর সাইমন ড্রিং বহু অনুষ্ঠান নির্মাণ করেন। এসব প্রামাণ্যচিত্র বা অনুষ্ঠানের উপস্থাপক, পরিচালক ও প্রযোজনায় ছিলেন নিজেই।

সাইমন ড্রিং-এর স্ত্রী ফিয়োনা কাজ করতেন রুমানিয়ায়। সাইমন ড্রিং সেখানে যেতেন। চলতি বছরের ১৬ই জুলাই প্রখ্যাত এই সাংবাদিক সায়মন ড্রিং রুমানিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। বাংলাদেশের মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে থাকবেন সায়মন ড্রিং। সায়মন ড্রিং তোমায় কোনোদিন ভুলবে না বাংলাদেশ।

*লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক*

# চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গু রোধে প্রয়োজন সচেতনতা

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

নিত্যনতুন ধরন পরিবর্তনের মাধ্যমে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে 'করোনা'। ডেল্টা ধরন যখন দেশে বিপর্যয় ডেকে আনছে, তখনই বর্ষার পুরানো শত্রু ডেঙ্গু শুরু করেছে তার চোখরাঙানি। করোনার এই পরিস্থিতি সরকার যেমন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে, আমাদের জন্য ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করেছে, তেমনি ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া মোকাবিলায়ও মশক নিধনসহ নানাবিধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এখন আমাদের সময় সচেতনতার, না হলে চরম বিপর্যয়ে পড়বে আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা।

ডেঙ্গু জ্বরের জন্য দায়ী ফ্ল্যাভিভাইরাসের অন্তর্ভুক্ত ডেঙ্গুভাইরাস বা ডেঙ্গিভাইরাস, আর চিকুনগুনিয়া জ্বর হয় চিকুনগুনিয়া ভাইরাস দিয়ে। এডিস মশা (A. aegypti) ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া ভাইরাসসহ ইয়েলো ফিভার ভাইরাস এবং জিকা ভাইরাসেরও বাহক। এদের মধ্যে ডেঙ্গুভাইরাসের ৪টি সেরোটাইপ পাওয়া গিয়েছে। যাদের প্রত্যেকেই রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। জীবাণুবাহী এডিস মশা কাউকে কামড়ালে সেই ব্যক্তি ৪ থেকে ৬ দিনের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হতে পারে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যদি কোনো জীবাণুবিহীন এডিস মশা কামড়ায় তাহলে সেই মশা ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এই জীবাণুবাহী মশাটি যখন অপর কোনো ব্যক্তিকে কামড়ায় তখন তার দেহে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে খুব সহজে একজন থেকে অপরের দেহে এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। তিন ধরনের ডেঙ্গু হতে দেখা যায়, ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু ফিভার, ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার, ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। চিকুনগুনিয়াও একইভাবে ছড়ায়, তবে তা ডেঙ্গুর মতো হেমোরেজিক ফিভার বা শক করে না।

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণত অল্পদিনেই সুস্থ হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে অসুস্থতা বাড়তে থাকে এবং মৃত্যুও ঘটতে দেখা যায়, যেমনটি হয়েছিল বিগত ২০১৯ সালে। চলতি বছরও এ হার আশঙ্কাজনক। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার অ্যান্ড কন্ট্রোল রুম থেকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ডেঙ্গু সংক্রমণের সংখ্যা শতাধিক হয়েছে এবং তা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, শুধু জুলাই মাসেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে ১,৯২০ জন, যা ২০২০ সালে সারা বছরজুড়ে আক্রান্ত সংখ্যার চেয়েও বেশি।

সাধারণ ভাইরাস জ্বরের যে লক্ষণ তার সবই ডেঙ্গু জ্বরে থাকে। ডেঙ্গু জ্বরের প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে সারা শরীরের মাংসপেশিতে বিশেষ করে কোমর, পিঠে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয় । ব্যথা, জ্বর হওয়ার ৪ বা ৫ দিনের এলার্জি বা ঘামাচির মতো সারা শরীরজুড়ে লালচে দানা দেখা যায়। এ জ্বর কম বা বেশি উভয়ই হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। খাবারে অরুচি ও বমি বমি ভাব হয়। সাধারণত জ্বর ৩-৪ দিন পর ভালো হয়ে যায়, তবে রক্তের প্লাটিলেট কমতে থাকে। কখনো মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে আবার জ্বর আসে এবং শরীরে র‍্যাশ দেখা যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে প্রচণ্ড মাথাব্যথার সঙ্গে শরীরেও প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয় এবং জ্বর থাকে। কখনো চোখের পেছনে ব্যথা অনুভব করে। যাদের বেশি জ্বর থাকে তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে যেমন চামড়ার নিচ, নাক, মুখ, দাঁত ও মাড়ি, চোখের মধ্যে এবং চোখের বাহিরে, কফ, বমি ও পায়খানার সঙ্গে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়। কারো কারো ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট হতে পারে আবার রোগীর রক্তনালী থেকে প্লাজমা লিকেজের কারণে বুকে ও পেটে পানি জমতে পারে। পানিশূন্যতা বেশি হওয়ায় প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যেতে পারে। অনেক সময় লিভার আক্রান্ত হয়ে রোগীর জন্ডিস, কিডনিতে আক্রান্ত হয়ে রেনাল ফেইলিউর ইত্যাদি জটিলতা দেখা দিতে পারে।

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার লক্ষণ প্রায় কাছাকাছি হলেও কিছু পার্থক্য আছে। চিকুনগুনিয়াতে র‍্যাশ সাধারণত ১-২ দিনেই দেখা যায়। এখানে মাংসপেশি বা পিঠ ব্যথার তুলনায় অস্থিসন্ধি, হাতের আঙুল এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা বেশি অনুভূত হয়। তবে চোখের পেছনে ব্যথা, রক্তক্ষরণ, প্লাটিলেট কমে যাওয়া, শক এগুলো হয় না বললেই চলে। চিকুনগুনিয়া সাধারণত দ্বিতীয় বার হয় না তবে ডেঙ্গু দ্বিতীয় বার হলে জটিলতা আরও বেড়ে যায় বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে।

*স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম ১লা আগস্ট ২০২১ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নগর ভবনের মেয়র হানিফ অডিটোরিয়ামে 'ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদারকরণ' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। ডিএসসিসি মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এসময় উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি*

উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, করোনার অনেক লক্ষণও ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার মতোই। কোভিড-১৯ সাধারণত সংক্রমিত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে সৃষ্ট

বায়ুকণা (Respiratory Droplets) থেকে ছড়ায়। এছাড়া সংক্রমিত ব্যক্তির জীবাণু হাঁচি-কাশির কারণে বা জীবাণুযুক্ত হাত দিয়ে স্পর্শ করার কারণে পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর পৃষ্ঠতলে লেগে থাকলে এবং সেই ভাইরাসযুক্ত পৃষ্ঠতল অন্য কেউ হাত দিয়ে স্পর্শ করে নাকে-মুখে-চোখে হাত দিলে করোনাভাইরাস নাক-মুখ-চোখ দিয়ে দেহে প্রবেশ করে। আক্রান্ত হওয়ার ২-১৪ দিনের মধ্যে উপসর্গ দেখা দেয়; গড়ে ৫ দিনের মধ্যে উপসর্গ দেখা যায়। ব্যাধিটির সাধারণ উপসর্গ হিসেবে জ্বর, শুকনো কাশি এবং শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে মাংসপেশির ব্যথা, গলায় ব্যথা, সর্দি, পেটের পীড়া দেখা যেতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপসর্গগুলো নমনীয় আকারে দেখা যায়, কিন্তু কিছু গুরুতর ক্ষেত্রে ফুসফুস প্রদাহ (নিউমোনিয়া) এবং বিভিন্ন অঙ্গের বিকলতাও দেখা যায়।

এ বছর বর্ষায় শহর এলাকায় বিশেষত ঢাকায় ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ লক্ষ করা যাচ্ছে। এজন্য বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে করোনা টেস্টের পাশাপাশি ডেঙ্গুর টেস্ট করাও জরুরি, বিশেষত শহরাঞ্চলে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরও সেরকম নির্দেশনা দিয়েছে।

খুবই সাধারণ কিছু নিয়মকানুন যা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সবসময় সকলের সচেতনতার জন্য সরকার কর্তৃক প্রচারিত হয়, সেগুলো মেনে চললে আমরা ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার বাহক এডিস মশার প্রকোপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়াসহ নতুনভাবে এ রোগের জীবাণুবাহী মশার আরও প্রসার না ঘটে সেজন্য সকলকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাসার পাশে, ছাদে, পরিত্যক্ত জিনিসের ভেতর, ফুলের টব, এয়ার কন্ডিশনার, ফ্রিজ, বাথরুম ইত্যাদি জায়গায় যেন পানি না জমে থাকে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। অন্তত ৩ দিনে ১ বার এসব জায়গা পরিষ্কার করতে হবে। সরকার এবং সিটি করপোরেশন এই করোনা মহামারির মধ্যেই ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশক নিধন অভিযান পরিচালনা করছে। এছাড়া জলাশয়, নর্দমা, রাস্তার পাশের গর্ত এগুলোও পরিষ্কার করার ব্যবস্থা নিচ্ছে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম এসব পরিত্যক্ত জিনিস জনগণের কাছ থেকে ক্রয় করারও ঘোষণা দিয়েছেন, যাতে সবাই উদ্বুদ্ধ হয়। তবে আমাদের সকলকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। করোনার জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা (ঘন ঘন সাবান-পানি বা ৬০% অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরা, যথাসম্ভব বাসায় থাকা, হাঁচি-কাশি শিষ্টাচার ইত্যাদি) মেনে চলার পাশাপাশি বাসাবাড়ি এবং উল্লিখিত স্থানসমূহও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এডিস মশা সকালে ও সন্ধ্যায় বেশি কামড়ায়, তাই এসময়ে বেশি সচেতনতা প্রয়োজন। সর্বোপরি ঢাকা শহরের সকল শিক্ষিত জনসাধারণ আমরা কমবেশি সবাই এ বিষয়ে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই রাজধানীবাসী এ রোগ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে। করোনার এই দিনগুলোতে বর্ষার সময় ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার বিষয়ে সতর্ক না থাকলে তা আমাদের জন্য বিশাল বিপদ ডেকে আনতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এবং সিটি করপোরেশন যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এ পরিস্থিতি মোকাবিলার। কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগ না থাকলে তা ফলপ্রসূ হবে না। তাই সচেতন হওয়ার এখনই সময়।

*লেখক: চিকিৎসক ও কলামিস্ট*

## বঙ্গবন্ধুর স্মরণে তুরস্কে ডাকটিকিট অবমুক্ত

তুরস্কের আঙ্কারায় বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে এক বিশেষ ডাকটিকিট অবমুক্ত করে সেদেশের ডাক বিভাগ। ২৮শে জুলাই তুরস্কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মস্‌য়ূদ মান্নান এনডিসি এবং সেদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাংস্কৃতিক উইংয়ের মহাপরিচালক ডেনিজ চাকার যৌথভাবে এই ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন।

এসময় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মস্‌য়ূদ মান্নান এনডিসি বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গণতন্ত্র, শান্তি এবং ধর্মনিরপেক্ষতার এক মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন মানবতা, জনগণের ক্ষমতা এবং আর্থসামাজিক মুক্তির অগ্রদূত।

বঙ্গবন্ধুর স্মরণে ছবিসহ ডাকটিকিট অবমুক্তির মধ্য দিয়ে দুদেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে বলে উভয়ে সহমত প্রকাশ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে ডাকটিকিটটি অবমুক্ত করায় রাষ্ট্রদূত তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ডাক বিভাগকে ধন্যবাদ জানান।

**প্রতিবেদন : জে. আর. পঙ্কজ**

# বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার দেশ

**রেজা নওফল হায়দার**

বাংলাদেশের খাতগুলো মূলত শ্রমনির্ভর। আইসিটি খাতে বাংলাদেশের সম্ভাবনা আছে প্রচুর। বর্তমানে এ খাত থেকে রপ্তানি আয় খুব বেশি না হলেও সরকার এ খাতকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। আর তাই দক্ষ জনবল গড়ে তোলার দিকে নজর দিয়েছে সরকার।

বিশ্বে চীন বা ভিয়েতনাম যেসব খাত থেকে সরে আসছে, সেসব খাত এখানে গুরুত্ব পাচ্ছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় সস্তা শ্রম। শ্রমনির্ভর খাতগুলোতে সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর।

বাংলাদেশের জন্য আগামী দিনে সম্ভাবনা আছে প্লাস্টিক, চামড়াশিল্প, জ্ঞানভিত্তিক আইসিটি খাতে। তবে ফিনিশড এবং কাঁচামালনির্ভর পণ্য ছোটো ও হালকা মেশিনারি পণ্য রপ্তানিতেও সম্ভাবনা রয়েছে। গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে বহুমুখীকরণ করেছে সরকার।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পোশাক খাতের ডেনিম, ওষুধ ও ওষুধের উপাদান, তথ্যপ্রযুক্তি, প্লাস্টিক অধিক প্রসিদ্ধ।

বাংলাদেশে চামড়াশিল্পের বিপুল সম্ভাবনায় বর্তমানে শিল্প মন্ত্রণালয় দেশীয় চামড়াশিল্পের বিকাশের জন্য ৫০ বছরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এতে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাওয়া যাবে। কোরবানিকে সামনে রেখে সরকারের সব ধরনের চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। কারণ এক কোরবানিতেই প্রায় কোটিখানেক চামড়া সংগৃহীত হয়, যার আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য বিপুল।

আইসিটি খাত সম্পর্কে এক সম্মেলনে আমাদের দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সূচনায় আমাদের বিপুল সংখ্যক মেধাবী ও সম্ভাবনাময় তরুণসমাজকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে বিশ্বমানের সফটওয়্যার ও সলিউশন্স উদ্ভাবন কাজ এগিয়ে চলছে। জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে কার্যকর মাইলফলক উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, আইসিটি নীতিমালা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর ব্যাবসায় গতিশীলতা আসবে এবং ব্যবসায়িক ঝুঁকি কমবে।

অন্যদিকে আমাদের আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ২০২১ সালে সবার জন্য ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। একইসঙ্গে ২০২১ সালের মধ্যে আইসিটি খাতে ২০ লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হবে। তিনি আরও বলেন, '২০০৮ সাল থেকে বিগত ১২ বছরে আইসিটি খাতে ১৫ লাখের বেশি তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা আশা করছি এ সংখ্যা ২০ লাখে পৌঁছাবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সরকার দক্ষ মানুষ তৈরির ওপর জোর দিয়েছে। ইতোমধ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্লকচেইন, রোবোটিকস, এআই, এআর, ভিআর, ক্লাউড কম্পিউটিং, থ্রিডি প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে সরকার। গড়ে তোলা হচ্ছে 'শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি'।

তিনি বলেন, বিগত ১২ বছরে দেশে একটি শক্তিশালী আইসিটি ব্যাকবোন তৈরি হয়েছে, যা গ্রাম থেকে গ্রামে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। দেশে তিন হাজার ৮শ' ইউনিয়ন এখন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায়। ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা হবে। করোনার মধ্যেও গত ১০ মাসে ই-কমার্সে এক লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হয়েছে। আইসিটি ব্যাকবোন তৈরি হওয়ার কারণে করোনা মহামারিকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অফিস-আদালত, চিকিৎসা সেবা, শিক্ষা ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের কার্যক্রম চালু রাখা সম্ভব হয়েছে। পোস্ট কোভিড-১৯ পরিকল্পনা করে মন্ত্রণালয়ের জমা দেওয়া হয়েছে।

---

*লেখক : প্রাবন্ধিক ও সিনিয়র সাংবাদিক, দৈনিক জনকণ্ঠ*

# মাতৃদুগ্ধ সৃষ্টিকর্তার নেয়ামত

**শামসুন্নাহার বেগম**

মায়ের বুকের দুধ জন্মের পর শিশুর জন্য সর্বোত্তম খাবার। আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক নবজাতক শিশুর জন্য মায়ের বুকে হালকা মিষ্টি ও উষ্ণ দুধ সৃষ্টি করে রাখেন, যা নবজাতক শিশুর জন্য বিশেষ উপযোগী। 'মাতৃদুগ্ধদান সুরক্ষায়: সকলের সম্মিলিত দায়'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১ থেকে ৭ই আগস্ট বিশ্বের প্রায় ১২০টি দেশের সঙ্গে আমাদের দেশেও পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ'। ১৯৯২ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সপ্তাহটি উদ্‌যাপন শুরু হয়। বাংলাদেশে ১৯৯২ সাল থেকে প্রতিবছর সপ্তাহটি পালিত হয়ে আসছে। ২০১০ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ জাতীয়ভাবে পালিত হয়ে আসছে। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২১ উপলক্ষে জাতীয় পুষ্টি সেবা, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি মাসব্যাপী পালিত হয়।

শিশু ভূমিষ্ঠের প্রথম ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ দিলে গর্ভফুল পড়তে সহজ হয়, রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মাতৃদুগ্ধ পানে শিশু যেমন সুস্থ-সবল হয়ে বেড়ে ওঠে, তেমনি তার সর্বোচ্চ শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত হয়। উপকৃত হন প্রসূতি নিজেও। মাতৃদুগ্ধ পান করালে বছরে আট লাখের বেশি শিশুর জীবন রক্ষা পাবে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। মাতৃদুগ্ধ পান করালে মায়েদের স্তন ক্যানসার, ডিম্বাশয়ের ক্যানসার, টাইপ-২ ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়। ডায়রিয়া হওয়ার প্রবণতা ও এর তীব্রতার ঝুঁকি কমাতে পারে বুকের দুধ। শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ এবং কানের প্রদাহ কমায় এটি। জন্মের পর প্রথম ছয়মাস শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, দাঁত ও হাড় গঠন ও মজবুত হয় বুকের দুধের কারণে। হজম প্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখাসহ প্রায় সব ভিটামিন ও খনিজের জোগান দেয় বুকের দুধ। ফিডারের দুধ বা ফর্মুলা খাবার কখনই এগুলো পূরণ করতে পারে না। আমাদের দেশে এখন হাজার হাজার মা এতে দুধ পান করার পরিবর্তে বাজারের কৃত্রিম দুধ পান করান। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। মায়ের দুধ হচ্ছে শিশুর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট খাবার এবং পানীয়। শিশুর রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থাসহ মায়ের দ্রুত আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে মায়ের বুকের দুধের বিকল্প নেই।

ওয়ার্ল্ড ব্রেস্টফিডিং ট্রেন্ডস ইনিশিয়েটিভ (ডাব্লিউবিটিআই) এ বছর বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহকে সামনে রেখে করোনাকালে মাতৃদুগ্ধদানে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছে। এলক্ষ্যে যেসব কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলা হয়েছে তাহলো– মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশুখাদ্য আইনের বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ করা; শিশুর খাবার ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমের পরিধি ও অর্থের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা; মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশুখাদ্য কোম্পানিগুলোর ডিজিটাল বাজারজাতকরণ কৌশল চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রণ করা; ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে মাতৃদুগ্ধদানে সহায়ক পরিবেশ ও মাতৃত্ব সুরক্ষা (ছুটি, বেতন-ভাতা, স্বাস্থ্য সেবা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের ভাতা প্রদান) নিশ্চিত করা; মাতৃদুগ্ধদানের সুরক্ষা, প্রচার ও সমর্থনে সমাজের বিভিন্ন স্তরের সমন্বয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ; স্বাস্থ্য সেবা কর্মীর কাউন্সেলিং ও মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশুখাদ্য আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ে মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশুখাদ্য আইনের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য হলো– মায়ের দুধ খাওয়ানোর

সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা; মায়ের দুধ খাওয়ানোকে জনস্বাস্থ্য সেবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোচ্চ সফলতার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা। আমাদের দেশে এই ব্যাপারটি অত্যন্ত অবহেলিত, কারণ ধরেই নেওয়া হয় যিনি জন্ম দিলেন তিনি তো স্তন্যদান করবেনই, এটা তার একার দায়িত্ব এবং অবধারিত ব্যাপার। বিষয়টি এত সহজ নয়, আর সে কারণেই দেখা যায় শেষ পর্যন্ত অনেক সদ্য প্রসূতির সন্তান মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে!! মাতৃদুগ্ধ বঞ্চিত শিশুরা বিভিন্ন রোগে সহজে আক্রান্ত হয় এবং কখনো কখনো অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আইবিএফএএন-এর তথ্য অনুযায়ী, শিশুকে মায়ের দুধ না খাওয়ালে নিউমোনিয়াজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ১৫ গুণ, ডায়রিয়ায় মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ১১ গুণ, শিশুদের অপুষ্টি ও অন্যান্য কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ১৪ গুণ এবং জন্ডিস, কানপাকা ও পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণসহ ডায়রিয়ার শঙ্কা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া শারীরিক বৃদ্ধি ও বুদ্ধির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, বয়সের তুলনায় ওজন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়, দীর্ঘস্থায়ী রোগের (ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্থূলতা) ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

একসময় বিশ্বব্যাপী মাতৃদুগ্ধ ছিল শিশুর অপরিহার্য প্রাকৃতিক খাদ্য। ফর্মুলা দুধের আবির্ভাবের আগে সব মা-ই অন্তত দুই বছর পর্যন্ত নিজের বুকের দুধ খাওয়াতো শিশুকে। কিন্তু ফর্মুলা দুধ বা খাদ্য উদ্ভাবন ও বিপণনের পর অনেকেই বড়ো বড়ো শিশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির অপপ্রচারে প্রভাবিত হয় এবং মায়ের দুধের বিকল্প হিসেবে অনেক শিশুকে ফর্মুলা দুধ খাওয়াতে শুরু করে। এটি শুধু বৈশ্বিক নয়, বাংলাদেশেরও চিত্র। তদুপরি দেশের আর্থসামাজিক পটভূমিতে নানা বদল ঘটেছে। নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে বিপুলসংখ্যক নারী। অর্থকরী পেশায় যুক্ত হয়েছে অনেকে। কর্মজীবী বা শ্রমজীবী এসব নারীর পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে অবিচ্ছিন্নভাবে ছয় মাস দুধ পান করানো সম্ভব নয়। অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও প্রতিকূল পরিবেশে শিশুকে যথাযথভাবে মাতৃদুগ্ধ পান করানো যায়ও না। বলা চলে, নানা কারণে দেশে অনেক শিশুই মায়ের বুকের দুধ খাওয়া এবং এর বিপুল সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে পরিবর্তিত বাস্তবতার সঙ্গে সংগতি রেখে সবখানে মাতৃদুগ্ধদানে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা জরুরি।

দেশে শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান তিনটি সমস্যা হলো– খর্বত্ব, কৃশকায়ত্ব এবং ওজনস্বল্পতা। এগুলো পুষ্টিহীনতার-ই মূর্ত প্রকাশ। বাংলাদেশে এককভাবে মায়ের দুধ পানের হার (ইবিএফ) ৫৫ শতাংশ। স্তন্যদানে সঠিক উপায় এবং অবিচ্ছিন্নভাবে নির্ধারিত সময়ব্যাপ্তি অনুসরণ না করায় অনেক শিশুই মায়ের দুধের সর্বোচ্চ সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং দুধ পানের লক্ষণীয় মাত্রায় উন্নীত করা এবং সঠিক কায়দায় মাতৃদুগ্ধ পান নিশ্চিতে সচেতনতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বেড়েছে। ফর্মুলার চেয়ে মায়ের দুধ কতটা ভালো, তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে। এসব প্রচেষ্টার ফলে অনেক দেশে মাতৃদুগ্ধ পানের হার (ইবিএফ) বেড়েছে। ইবিএফ হারে শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে– ক্রোয়েশিয়া ৯৮ দশমিক ১৩ শতাংশ, রুয়ান্ডা ৮৬ দশমিক ৯৩, চিলি ৮৬ দশমিক ৫০, বুরুন্ডি ৮২ দশমিক ৩৫ এবং শ্রীলঙ্কা ৮২ শতাংশ। দেশগুলো ঘর থেকে কর্মক্ষেত্রসহ সব ক্ষেত্রে শিশু ও মায়ের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ ব্রেস্টফিডিং কর্নার স্থাপনসহ শিশুকে মায়ের কাছাকাছি রাখার সুব্যবস্থা করেছে।

করোনাভাইরাসে সংক্রমিত মা কি সন্তানকে বুকের দুধ পান করাতে পারবেন? যদি না পারেন তাহলে কী করতে হবে? করোনায় আক্রান্ত অন্য মায়ের দুধ কি পান করানো যাবে? দুগ্ধদানকারী মা কি করোনার টিকা নিতে পারবেন? বিশ্বজুড়ে করোনা হানা দেওয়ার পর থেকেই এ প্রশ্নগুলো উঠেছে অসংখ্যবার। করোনার দেড় বছর পার হলেও মায়েদের বিশেষ করে নতুন মায়েদের এ নিয়ে উদ্বেগ দূর হতে চাচ্ছে না যেন। মাতৃদুগ্ধ পান নিয়ে গত বছরের মে মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বারবার জিজ্ঞাসা করা বা ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড শিরোনামে এ সংক্রান্ত ২০টি প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছে, কোভিডে আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে শিশু সংক্রমিত হয় না। আক্রান্ত মা কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড হাত ধুয়ে ও স্তন ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে মাস্ক পরে দুধ পান করাতে পারবেন।

---

*লেখক: প্রাবন্ধিক*

*তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এর জন্য খাম দিয়ে তৈরি সর্ববৃহৎ পতাকা উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি*

## ১৬ হাজার খাম দিয়ে তৈরি সর্ববৃহৎ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

২৪শে জুলাই রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে কারুশিল্পী সাইমন ইমরান হায়দারের ১৬ হাজার খাম দিয়ে তৈরি ২৪০ বর্গমিটারের এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আমাদের অহংকার ও গৌরবের; যা জাতি হিসেবে আমাদের মাথা উঁচু করবে, মর্যাদা সমুন্নত রাখবে।

তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত লাল-সবুজের পতাকা জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এ পতাকা আমাদের উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে, এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা জোগায়। তারুণ্যের অহংকার এ পতাকাকে পৃথিবীর দেশে দেশে তুলে ধরবে। বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে বলবে শাবাশ বাংলাদেশ!

২০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১২ মিটার প্রস্থের বিশালাকার পতাকার গিনেস বুকের অফিসিয়াল স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা।

**প্রতিবেদন: ইশরাত হোসেন**

# যখন সমান্তরাল

## রফিকুর রশীদ

গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার সুপারের হাত থেকে রেডিওটা মেঝেতে পড়ে খানখান হয়ে ভেঙেচুরে যায়। চীন থেকে আসা সস্তা রেডিও। পাসিকের হালকা বডি। প্যাগোডার মতো গোলাকৃতি দেখতে। মাঝখানে তার ক্রমান্বয়ে উঁচু হওয়া গম্বুজ। আকৃতিটা পছন্দ না হলেও অল্প দামের এই রেডিওতে শব্দ হয় গম্‌গম্‌ করে। বাংলাদেশ বেতার, আকাশবাণী, ভয়েস অব আমেরিকা, এমনকি রেডিও পিকিং পর্যন্ত অনায়াসে শোনা যায়। খবর শোনার নেশাটা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে। দূরের এক মাদ্রাসায় তখন সে উঁচু ক্লাসের ছাত্র। তার বয়সি অধিকাংশ যুবক যুদ্ধে গেছে, তার যাওয়া হয়নি নানাবিধ কারণে। বিশেষত বিছানায় পড়ে থাকা পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবাকে ফেলে রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া তার হয়ে ওঠেনি। অতি শৈশবে বাবার কাছ থেকেই দেশাত্মবোধের শিক্ষা সে পেয়েছে। তবু সেই যুদ্ধের সময়ে জন্মাদাতা বাবার চেয়ে দেশকে বড়ো করে দেখতে পারেনি এটাই সত্যি। সারা দেশের যুদ্ধপরিস্থিতির খবর শোনার জন্যে বুকের ভেতরে ভয়ানক ছটফট করত বলে এখানে সেখানে লুকিয়ে-চুরিয়ে রেডিও শুনত, স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুনে এসে বাবাকে তার সারমর্ম শোনালে পাণ্ডুর মুখে রোদের ঝিলিক খেলা করত। বাবা তাকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিয়েছে, তবু যাওয়া হয়নি। অথচ যুদ্ধের শেষের দিকে স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার অপরাধে তারাইলের কুদ্দুছ গাজী তাকে জোর করে রাজাকারে ভর্তি করানোর উদ্যোগ নিলে অসুস্থ বাবাকে ফেলে এক সময় তাকে পালাতেই হয়। সেই থেকে রেডিও শোনার অভ্যাস তার।

স্বাধীন দেশে মাদ্রাসার চাকরিতে ঢোকার পর নিজের উপার্জিত অর্থে এই সস্তা রেডিও কেনা হয়। ফজরের নামাজ শেষে মিনিট বিশেক কোরান তেলাওয়াত করে মনোযোগ দিয়ে। নিজের কণ্ঠ নিজে থেকেই বেশ কয়েকভাবে ভেঙেচুরে ছহি উচ্চারণে তেলাওয়াতের চেষ্টা চালায়। কোনো একদিন রেডিওতে কোরান তেলাওয়াতের গোপন ইচ্ছে অনেকদিন থেকে পুষে রাখে বুকের মধ্যে। এই জন্যে অতি যত্নে তার কান খাড়া করে রেডিও শোনার অভ্যেস। এরপর বুকের উপরে প্যাগোডা চাপিয়ে নব্‌ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিছানায় শুয়ে চলে খবর শোনার পালা। খবর শুনতে শুনতে এক সময় আলস্য আসে, চোখের পাতা মুদে আসে; কতদিন গোলাকৃতি রেডিও বুকের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে যায়। পাসিক বডির এখানে-ওখানে একটু-আধটু ভেঙেচুরেও যায়। তবু রেডিও তাকে শুনতেই হবে।

সেদিন ভোরবেলা রেডিও'র নব্‌ ঘুরাতেই যেনবা তার সারা দেহ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। কোনো এক খুনি মেজর সদর্পে নিজের নাম ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পৈশাচিক ও নৃশংসতম খবরটি পরিবেশন করছে। বাংলাদেশ বেতারের পরিবর্তে রেডিও বাংলাদেশ বলছে। কোরান তেলাওয়াতের ফাঁকে ফাঁকে কারফিউ ঘোষণা করছে। ঘরের বাইরে বেরুনোর উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি হচ্ছে। গওহরডাঙা মাদ্রাসার সুপার চটজলদি বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায়। আর তক্ষুনি রেডিওটা মেঝেতে আছড়ে পড়ে খোলামকুচির মতো ছড়িয়ে যায়। নাকি ভয়ানক ক্ষোভে-দুঃখে-রাগে ভঙ্গুর এই বস্তুটি সে আছড়ে ভেঙে ফেলে কি না তাই বা কে জানে সঠিকভাবে।

মাদ্রাসা সুপার বলতে যেমন গরুগম্ভীর বয়স্ক মুরুব্বিজনের ছবি ভেসে ওঠে, এই গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার সুপার কিন্তু মোটেই তেমন নয়। শুধু বয়সে নবীনই নয় দৃষ্টিভঙ্গিতেও সে অনেক আধুনিক। তার শিক্ষকতা-জীবন শুরু হয় অন্য এক মাদ্রাসায়। বাড়ি থেকে অনেক দূরে, নদীপার হয়ে যেতে হয়, অসুস্থ বাবার নিয়মিত খোঁজখবর রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। অল্প কিছুদিন আগে এই গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার হিসেবে যোগদানের সুযোগ হয়। মাখরাজসহ চমৎকার সুললিত কণ্ঠের কোরান তেলাওয়াতের ব্যাপারটা ছিল তার বাড়তি যোগ্যতা। গওহরডাঙ্গাকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় ঘোপেরডাঙ্গা, এ গ্রামে তার নানাবাড়ি-মামাবাড়ি। তাদের প্রভাবও হয়ত কিছু কাজ করে থাকবে। মাদ্রাসার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার হলেও লিলাহ বোর্ডিংয়ের পূর্ণ সুপার হিসেবেই তাকে দায়িত্ব নিতে হয়। ভালোই লাগে ঘোপেরডাঙ্গার কর্মজীবন। বাড়ি থেকে বিশেষ দূরে নয় বলে প্রতিদিনই শয্যাশায়ী বাবাসহ পরিবারের সবার খবরাখবর নেওয়া যায়, ইচ্ছে হলে সন্ধেনাগাদ ঘুরেও আসা যায় বাবা-মাকে দেখে। বড়ো হুজুর, মানে মাদ্রাসার বয়োবৃদ্ধ সুপার কিছুদিন আগে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যাবার ফলে সব দায়িত্ব এসে পড়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারের উপরে। সবদিক তাকেই সামলাতে হয়। কাগজ-কলমে পরিবর্তন না হলেও তাকেই সবাই সুপার বলে জানে এবং মানেও।

ভোরবেলা আকাশ কাঁপানো শোকসংবাদটি শোনার পর গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার সুপার এমনই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে যে এখন তার কী যে করণীয়, বেশ কিছুক্ষণ তা বুঝতেই পারে না। ঘরের মেঝেতে চৌচির হয়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকা রেডিও'র দিকে তাকিয়ে থাকে আনমনে। শতেক চেষ্টায় জোড়াতালি দিয়েও রেডিওটির গোলাকার অবয়ব আর ফিরে আসবে না একথা ভাবতেই রোগজর্জর বাবার মুখ মনে পড়ে যায়। এসময়ে কেন মনে পড়ে মৃতপ্রায় মানুষটিকে! একদা তার মুখটাও ভারি গোলগাল ছিল, দিনে দিনে সেই চেহারা ভেঙেচুরে কী যে হাল হয়েছে! চোখ তুলে তাকানো যায় না সেই মুখের দিকে। নাহ্, রেডিও'র ভগ্নাংশ কুড়াতে মোটেই তৎপর হয় না। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লিলাহ বোর্ডিংয়ের ছেলেপিলেকে ডেকে সে একত্রিত করে, ইচ্ছে হয় সবাইকে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে দাঁড় করিয়ে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গেয়ে উঠতে। কিন্তু সে পারে না। তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এমনকি যেনবা মৃদু কাঁপুনিও অনুভূত হয় শরীরে। তখন নিজেকে কোনোমতে সম্বরণ করে ছেলেদের কোরান তেলাওয়াতের আদেশ দেয়। ছেলেরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে হুজুরের দিকে। এ আর নতুন কী! প্রতিদিন সকালে কোরান তেলাওয়াত করা তো নৈমিত্তিক ঘটনা, এভাবে হঠাৎ জোর দিয়ে বলার মানে কী!

শোকসংবাদটি নিজে মুখে ঘোষণা করতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে সুপারের। তবু তা করতে হয়। বেশ কয়েকটি বালক ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সুপার তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়। তারপর কোরান তেলাওয়াতের সঙ্গে দোয়া-দরুদও পাঠ করতে বলে। সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়– বঙ্গবন্ধুসহ সকল শহিদের আত্মার শান্তি কামনা করে সুপার নিজেই বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করবে।

সকল শহিদ মানে কী!

সকল শহিদের আত্মার শান্তি কামনার কথা মনে আসতেই সহসা নিভৃতে প্রশ্ন জাগে– কজন শহিদ হয়েছে? রেডিও'র ঘোষণায় কি সে কথা বুঝার উপায় আছে? স্বেচ্ছাচারী এক মেজরের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছেন। কীভাবে নিহত হয়েছেন, অঘটনটি যদি তাঁর বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডির নিজস্ব বাড়িতে ঘটে থাকে, তাহলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যের অবস্থা কী, কেমন আছেন তারা, নিহত মুজিবের নশ্বর মরদেহ কোথায় আছে, কোথায় বা সমাহিত হবে– কিছুই জানার উপায় নেই। রেডিওতে এসবের কোনো আভাস নেই। হামদ-নাত-কোরান তেলাওয়াতের ফাঁকে ফাঁকে মুজিব হত্যার খবরটিই বারংবার প্রচারিত হচ্ছে নিজের রেডিও ভেঙে যাবার পূর্ব পর্যন্ত এটুকুই শুনতে পেয়েছে গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার সুপার। এটুকু তথ্যে কার তৃষ্ণা মেটে! বরং ওই তথ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকা আরও অনেক অনিবার্য প্রশ্ন মাথার মধ্যে কিলবিল করে, মগজে আঘাত হানে, হৃদয়ে ঝড় তোলে তোলপাড়। কিন্তু জবাব কোথায় এসব প্রশ্নের?

মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে সুপার।

তার ইচ্ছে করে গিমাডাঙ্গা, বালাডাঙ্গা, সোনাখালি, পাটগাতি, কলাতলা, মিত্রডাঙ্গা, তারাইল, পাথরঘাটা- মধুমতীর আঁচল ছোঁয়া প্রতিটি জনপদে ঘুরে ঘুরে জিজ্ঞেস করতে; তোমরা কি শুনেছ কী সর্বনাশ হয়ে গেছে গতরাতে? মাটগার্ড খোলা একটি সাইকেল আছে তার, সেটার হ্যান্ডেলে হাত রাখতেই বিরক্তিতে মন বিষিয়ে যায়। ছেলেমানুষের মতো অকারণে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় সাইকেল। নদীবেষ্টিত এ অঞ্চলে শ্রাবণের এই কাদাজলের মধ্যে যানবাহনটিকে বড়োই তুচ্ছ মনে হয়। তখন সে হাঁটতে শুরু করে। দুটো পায়ের উপরে ভর দিয়েই তার ইচ্ছে করে খুলনা-বরিশাল-চট্টগ্রাম-কুমিল্লা-রাজশাহী-রংপুর-দিনাজপুর-যশোরসহ সারা দেশ ঘুরে আসতে। ইচ্ছে করে ঢাকার কথা শুধাতে– তোমরা কি জানো ঢাকার আকাশ থেকে কেমন করে খসে পড়েছে জ্যোতির্ময় নক্ষত্র?

উদ্‌ভ্রান্ত সুপার সারাটা দিন পথে পথে টো টো করে ঘোরে। বুকের মধ্যে ফাঁকা লাগে, হাহাকার গুমড়ে ওঠে। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে সেই কারণও নির্ণয় করতে পারে না। তার তো কোনো রাজনীতি সম্পৃক্ততা নেই, তাহলে? শ্রাবণ-আকাশ নুয়ে আছে, বৃষ্টিধারায় যদি চরাচর ভাসিয়ে নিয়ে যেত, তাহলে কেমন হতো কে জানে! গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার সুপার বয়সে নবীন হলেও এলাকার মানুষের কাছে তার বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা আছে। ফলে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে যখনই যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, প্রায় সবাই তার পথ আগ্‌লেছে, কেউ কেউ চোখে চোখ রেখে শুধিয়েছে– যাচ্ছেন কোথায় হুজুর? ঢাকার খবর শোনেননি?

এ খবর না শোনার তো কোনো উপায় নেই। সারা দেশে ঘরে ঘরে দোকানে-বাজারে অসংখ্য রেডিও ঘ্যানর ঘ্যানর করে একই তথ্য ক্লান্তিহীনভাবে প্রচার করে চলেছে। নতুন তথ্য যোগ হয়েছে অনেক পরে, জুম্মার নামাজ গড়িয়ে গেলে তারপর শোনা গেল, খোন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে, সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীর প্রধানরা আনুগত্য অভিনন্দন জানিয়েছেন নতুন সরকারের প্রতি। এমনকি পুলিশ এবং রক্ষীবাহিনী-প্রধানও পিছিয়ে থাকেননি। সন্ধ্যা নাগাদ নতুন প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন রেডিওতে। কোথায় জয় বাংলা! ভাষণ শেষে আবার সেই পাকিস্তানি জামানার জিন্দাবাদ। কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই। মুক্তিযুদ্ধে পোড় খাওয়া দেশের মানুষ প্রতিবাদ করবে কোন সাহসে! স্থানীয় বাজারের এক ব্যবসায়ী খুব বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছে– ঢাকার রাজপথ দাবড়ে বেড়াচ্ছে সেনাবাহিনীর ট্যাংক-বহর, সৈনিকদের কাঁধে কাঁধে খোলা স্টেনগান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তাণ্ডব নয় তবু আমি জিপ কিংবা ট্যাংক বহরের সামনে বাঙালি সৈনিকের বদরাগী চেহারা দেখে আতঙ্কিত মানুষজনের চোখে একাত্তরের বিভীষিকার ছবিই হয়তবা ফুটে ওঠে। ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে 'বালিতে মুখ গোঁজা উটপাখি' হয়ে ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

সারাটা দিনের শেষে গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার সুপারের আবার মনে পড়ে যায় জন্মাদাতা বাবার কথা। দুনিয়া কাঁপানো এত বড়ো খবর তাকে কেউ শুনিয়েছে কি না, যদি কোনোভাবে শুনেও থাকেন, এমন কুৎসিত সংবাদের ধাক্কা কীভাবে সামলাবেন ওই শয্যাশায়ী রোগজর্জর মানুষটি, তাই নিয়ে খুব ভাবনা হয়। তার মনে হয় এসময়ে সন্তানকে চোখের সামনে দেখে মৃতপ্রায় মানুষটি যদি একটুখানিও বুকে বল পায়। মাত্র তিনদিন আগে সে বাবাকে দেখে এসেছে। শরীর তার ভালো নেই। বিছানায় পড়ে থেকে থেকে পিঠে ঘা হয়ে গেছে। এদিকে বুকে তার শ্লেষ্মা। আকাশে মেঘ জমলে শ্বাসকষ্ট বাড়ে। অর্জুন গাছের ছালবাকল বেঁটে বুকে লাগিয়ে দিয়েছে মা। নাহ্, আর দেরি করা চলে না, লিলাহ বোর্ডিংয়ের ছেলেদের কানের কাছে মুখ নামিয়ে কী যেন বলে মাদ্রাসা-সুপার, তারপর হনহন করে বেরিয়ে পড়ে বাড়ির উদ্দেশে। এমন উৎকণ্ঠাপূর্ণ একটা দিন কাটানোর পর তার মনও যেন একটুখানি ছায়াঘন আশ্রয় খোঁজে। বাড়ি সে যাবেই।

পরদিন দুপুর গড়িয়ে যাবার পর এ দিগরে যখন শ্রাবণ মেঘের ছায়া নেমে আসে, তখনই টুঙ্গিপাড়ার আকাশে উড়ে আসে এক দুর্বিনীত সামরিক হেলিকপ্টার। থমকে দাঁড়িয়ে থাকা গুমোট বাতাস চিরে হেলিকপ্টারের পাখা যে ভয়ংকর শব্দ ছড়ায়, তা এ জনপদের নির্বিবাদী মানুষের মনে তীব্র আতঙ্কের হল্কা ছড়ায়। মাথার ওপরে খানিকটা বেলা বাড়তে বাড়তে এলাকার উৎকণ্ঠিত মানুষজন সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে দেখতে পায়– শত শত পুলিশ এসে বঙ্গবন্ধুর পৈত্রিক বাড়ি ঘিরে ফেলছে। কেন এ ঘেরাও, মানুষ বুঝতে পারে না। যাকে নিয়ে সারা দুনিয়ার মাথাব্যথা, তাঁকে তো ঢাকার বাড়িতেই হত্যা করা হয়েছে সপরিবারে, তারপরও এই অজপাড়াগাঁয়ে সশস্ত্র পুলিশের এই ঘেরাও কর্মসূচির কী যে মানে! দুপুর নাগাদ সেই ঘেরাও-এর বৃত্ত আরও সম্প্রসারিত হয়। গ্রামের মানুষ ভয়-তড়াশে দূরে সরে যায়। টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে হেলিকপ্টার অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে বিপজ্জনক সাইরেন বাজিয়ে অতিদ্রুত আতঙ্কের হল্কা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর হেলিকপ্টার থেকে গটমট করে নেমে আসে সশস্ত্র দেবদূতেরা। তাদের চোখেমুখে কী যে অগ্নিজ্যোতি– কেউ সামনে পড়লে ভস্ম হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তারা এসেছে টুঙ্গিপাড়ার খোকা, শেখ লুৎফর রহমানের পুত্র শেখ মুজিবুর রহমানের বুলেট ঝাঁঝরা মরদেহ টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে ফিরিয়ে দিতে।

শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশু রাসেল এমনকি তাদের মা-জননীর নিথর দেহ বনানীতে সমাহিত করা হলেও শেখ মুজিবের প্রাণহীন দেহ ঢাকায় রাখতে সাহস হয়নি, আবার যদি সাতই মার্চের মতো আঙুল উঁচিয়ে বাঙালি জাতিকে কোনো আদেশ দেয়! এদিকে মরদেহ টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে আসার পরও ভয়ানক তাড়াহুড়ো তাদের– যদিবা মধুমতী-বাইগার নদী রুষে ওঠে, ঘিরে ধরে অক্টোপাসের মতো। পিতার কবরের পাশে পুত্রের জন্যে গোর খনন হয়েছে, অতি দ্রুত অতি সংক্ষেপে গোসল, দাফন, জানাজা শেষে মরদেহ মাটির বিছানায় শুইয়ে দিতে পারলেই তাদের দায় সারা হয়। না না, হাজার হাজার লোকজনের দরকার নেই, সেনা-অফিসার, জানিয়ে দেয়– ৮/১০ জন লোক হলেই চলবে। কুইক। জলদি কর।

বাপরে বাপ! এ কী সিভিল হুকুম! আর্মি আদেশ বলে কথা! মুর্দা গোসলের জন্যে এল ৫৭০ কাপড় কাচা সাবান, রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল থেকে রিলিফের সস্তা কাপড় এল কাফনের জন্যে। মরা হাতির দাম লাখ টাকা হতে পারে, বীর (!) সেনাদের গুলিতে নিহত প্রেসিডেন্টের মরদেহের কিইবা দাম, কিইবা ইজ্জত! জানাজা? ওই ৮/১০ জনেই হবে। আর যা-ই হোক, এদেশে তো মোল্লা-মৌলবির অভাব হবার কথা নয়, একজনের মাথায় টুপি চাপিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেই হবে; জলদি লাগাও। জলদি।

টুঙ্গিপাড়ায় যখন এই সব ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ব্যাপারটা কাকতালীয় হলেও সত্যি– গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার সুপার তখন তার বাবার জানাজায় ইমামতি করতে দাঁড়িয়েছে। গত রাতে নয়, অঘটনটা ঘটেছে সকালে। বাবা বঙ্গবন্ধুভক্ত মানুষ বলেই পুত্র এত বড়ো ট্র্যাজিক ঘটনার বিবরণ আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করে। গতকাল থেকে কেউ তাকে বলেনি। বলবে কী, চলৎশক্তিরহিত এই মানুষটিরও যে সামান্য পরিমাণে বোধবুদ্ধি আছে, সে-কথাই তো কারো মনে পড়ে না। কে বলবে এই পাথর-প্রতিম ভারি কথা! পুত্রের মুখে সব শুনে চোখ দুটো তার বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তারপর মাথাটা এক পাশে হেলে পড়ে। এ ঘটনার পর পুত্র নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং নিজেকে মনে হয় পিতৃহন্তারক। জাতির পিতাকে পরিকল্পিতভাবে যারা হত্যা করেছে, নিজেকে তাদের মতোই অপরাধী মনে হয়। আত্মীয়স্বজন এসে তাকে সান্ত্বনা দেয়– অসুস্থ মানুষটি প্রতিনিয়ত কষ্ট পাচ্ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে এ-মৃত্যু অনেকটা প্রত্যাশিতই বলা চলে। জানাজায় দাঁড়িয়েও প্রবল কান্নাস্রোত আছড়ে পড়ে তার বুকে, আপন মনে হাহাকার করে ওঠে– আমি কি এই জন্যে গওহরডাঙ্গা থেকে ছুটে এসেছিলাম...।

এরপর আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শি সবাই জানাজা ও মোনাজাত পরিচালনার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় তার উপরেই। পিতার জন্যে পুত্রের দোয়া সবচেয়ে উত্তম, পুত্রের হাত আল্লাহ কিছুতেই ফিরিয়ে দেন না। এখানে আলেম পুত্রই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। সবার পরামর্শে মোনাজাতের জন্যে হাত তোলার পর আবার তার কান্না আসে, বাঁধভাঙা কান্না। সেই কান্নার শরীর পেঁচিয়ে কিছু কিছু বাক্য স্ফুট হয়। শৈশব-কৈশোরের পিতৃস্মৃতির কথা আসে, পিতৃস্নেহের কথা আসে, পিতার ব্যক্তিত্বের নানাদিক উঠে আসে, নিজের অযোগ্যতার কথা বারবার উচ্চারিত হয়; এমনই সুললিত ভঙ্গিতে মোনাজাত চলতে থাকে যে উপস্থিত সবারই দু'চোখের তটিনী উপচে কান্না পায়। ফুঁপিয়ে ওঠে। কান্নার সংক্রমণ-ক্ষমতা এমনই প্রবল যে অনেক সময় প্রতিরোধ-অযোগ্য হয়ে ওঠে। ইমামের সব কথা তখন সবার কানেও ঢোকে না, গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে কেবল আমিন আমিন বলতেই থাকে।

কেউ টের পায় না সেদিনের মোনাজাতের মধ্যে কখন আলগোছে বঙ্গবন্ধু ঢুকে পড়েন। ইমাম সাহেব আল্লাহর কাছে আকুল ফরিয়াদ জানিয়ে বলে– শুনেছি পিতার জন্যে পুত্রের দোয়া তুমি কবুল কর, যার তিন পুত্র থেকেও নেই, তিনজনকেই খুন করা হয়েছে, তাঁর জন্যে কে চাইবে দোয়া! তিনি তো জাতির পিতা, আমি এক অধম সন্তান হয়ে তাঁর জন্যে দোয়া চাইছি মাবুদ, তুমি কবুল কর।

উপস্থিত সকলে সমস্বরে উচ্চারণ করে– আমিন! সুম্মা আমিন।


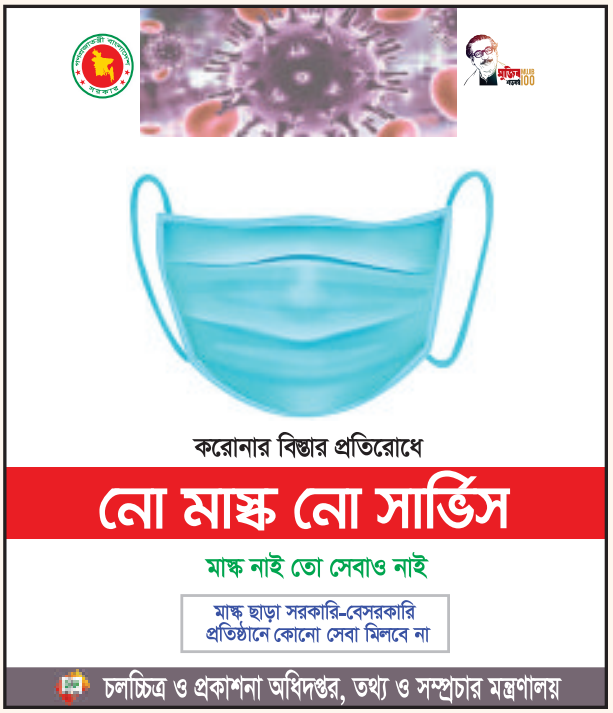

## কারাগারের হলুদপাখিরা

### মুহম্মদ নূরুল হুদা

যৌবনের শুরুতেই জেলের প্রাচীরে
দেখেছো অবাক চোখে পাখি এক জোড়া;
সে পাখি কুটুম্ব পাখি হলুদবরণ,
এ বাংলার বিলে-ঝিলে পাখিদের ওড়া।
সকালেই আসে পাখি, যায় দ্বিপ্রহরে,
বিকেল নীলের নীড়ে, সাঁঝে ফেরে ঘরে।
তুমি তাঁর অপেক্ষায় বসে থাকো স্থির;
কারাগারে মুক্তবন্দি কারাগার নীড়।
ইচ্ছে হয় উড়ে যাবে পাখির ডানায়
রাঢ় বঙ্গ পার হয়ে কাছে কিংবা দূরে;
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে কানায় কানায়
মুক্তির মীমাংসা বুকে আসবেই ঘুরে।
জন্মেই মানবপাখি অচিন খাঁচায়
লালন করেছো বুকে স্বাধীনতা সাধ,
বাউলের একতারা তোমাকে বাজায়,
মানবজমিন আদি করেছো আবাদ।
ধর্মে-বর্ণে মানুষকে করোনি প্রভেদ,
মানবতা মূল ধর্ম, সিদ্ধ সদাচার;
কবিতার কর্মধর্ম, সুন্দর-অভেদ,
বিশ্বনিকেতনে মুক্তি, প্রশান্তি অপার।
পূর্বপুরুষেরা ফেরে পাখি হয়ে নীড়ে,
গণবাঙালির গঙ্গা-মধুমতী তীরে;
স্বদেশের সীমা ছেড়ে সবার স্বদেশ,
পৃথিবী সীমানাহীন মুক্ত আদিদেশ।
তুমি আমি সেই আদিদেশের সন্তান
বুকে আজও আদিপিতা মাতার সুঘ্রাণ;
উপনিবেশের ঘের পার হয়ে তুমি
শনাক্ত করেছো জাতি, আর জাতিভূমি।
ভাষায়, ভূমিতে আর সখ্যে সংস্কৃতির
দেশে দেশে মানুষের আছে ভিন্ন নীড়;
জাতিসত্যে বিভাজিত সব নীড় মিলে
অভিন্ন মানবনীড়, ধরণি-নিখিলে।
পাখিরা তো আসে উড়ে দেশ থেকে দেশে
পাখিরা তো যায় উড়ে বাউলের বেশে;
কাঁটাতার ঘেরা এই রাষ্ট্র-কারাগারে
পাখিরাও চোখ মারে খুব আড়েঠারে।
জাতিরাষ্ট্র পরিবার, বিচিত্র সংসার
সাজিয়েছে জলেস্থলে নীলের ভিটায়;
শত শতাব্দীর সব রাষ্ট্রকাঁটাতার
পাখিরা পেরিয়ে যায় তবু ধৃষ্ঠতায়।
হলুদপাখিরা সেই মুক্ত পাখি-সুত
অভিন্ন মানব-রাষ্ট্রে যোগ্য রাষ্ট্রদূত।
তারা আসে তারা যায় স্বাধীন বিভায়,
প্রাণে প্রাণে যুক্ত তারা, প্রাণ-সীমানায়।
প্রাণ হও প্রাণ হও, নও নানা প্রাণী;
প্রাণ-সমতায় প্রাণী হও ধ্যানী-জ্ঞানী
হও ধ্যানী-জ্ঞানী, হও ধ্যানী-জ্ঞানী।

## জাতির পিতা

### নাসির আহমেদ

ডানপিটে আর খুব সাহসী 'খোকা' সত্যপথে
দারুণ সে একরোখা।
গরিব-দুঃখী মানুষ প্রিয় তাঁর
তাঁর মতো আর হৃদয় বড়ো কার!

পাকিস্তানি দুঃশাসনে দেশ
লুটেরারা করছিল নিঃশেষ।
প্রতিবাদী খোকাই হয়ে বড়ো
ডাকটি দিলেন– সংগ্রামী পথ ধরো।

জেল-জুলুমে দমে না তো মোটে
আগুনঝরা বক্তৃতা তাঁর ঠোঁটে!
একাত্তরের মার্চে তাঁরই ডাকে
বীর বাঙালি স্বাধীনতার স্বপ্ন মনে আঁকে।

তোমার ডাকেই যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পেলাম
জাতির পিতা, তোমাকে লালসেলাম!
তোমার মতন কে আছেন আর বঙ্গে?
হয় তুলনা একটু তোমার সঙ্গে!

## যেভাবে ছিলেন

### মাকিদ হায়দার

অগ্নিস্নানে আনতে হবে আপনাকে, সেদিন
যেভাবে ছিলেন
যাবতীয় অভ্যুত্থানে।

স্বাধীনতার দীপ্ত উচ্চারণে সেইভাবেই
আপনাকে থাকতে হবে আমার
এবং আমাদের সঙ্গে সাথে।

প্রয়োজনে হেঁটে যাব টুঙ্গিপাড়া
যেমন গিয়েছি
ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে শেখ শহিদের সাথে
গিয়েছি যেমন
রেসকোর্সের ময়দানে উদ্ধত যুবকের মতো
মার্চের উত্তাল দিনে।

পুনরায় যাবো, বার বার যাবো
যেভাবে গিয়েছি
মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত প্রান্তরে
আপনার উদাত্ত আহ্বানে।

অগ্রে-পশ্চাতে সেই সাতই মার্চের দীপ্তবাণীর ভাষণের মতো
পুনরায় আপনাকে দাঁড়িয়ে বলতে হবে–
জয় বাংলা, জয় বাংলা
সেখানে আবার থাকব আমরা।

থাকবে মধুমতী।
থাকবে ইছামতী।

## বাংলা মুজিবময়

### মুহাম্মদ সামাদ

আকাশ ভরা আলোর ঢলে
শাপলা ফুলে নদীর জলে
জোনাকজ্বলা বাঁশবাগানে
ভাটিয়ালির সুরের টানে
নায়ের পালে মাঝির গানে
ধানের ক্ষেতে তিল-তিসিতে
শিশির ভেজা ঘাসের দেশে
মায়ের কোলে মুজিব আসে।

ভালোবাসায় ভরিয়ে তীর
পদ্মা মেঘনা মধুমতীর
জনসাগর উছলে দিয়ে
বাংলাদেশের বিজয় নিয়ে
মুজিব আসে বীরের বেশে।

সবুজ বনে পাখির গানে
বাতাস ফেরে খুশির তানে
তাকাও কাছে তাকাও দূরে
পাহাড় ভেঙে পাতাল ফুঁড়ে
মুজিব হাসে আকাশ জুড়ে।

হঠাৎ দেখি আঁধার নামে
হারিয়ে যায় তারার মেলা
চাঁদের আলো মেঘের খেলা
আমের বোলে শিমুল ফুলে
পাখ-পাখালি সবাই থামে!

খোকার চোখে খুকির চোখে
আকাশ ভেঙে কান্না নামে
লক্ষ বোনের চোখের জলে
মা-যে হারায় অতল তলে
হে দয়াময়– কী দুঃসময়!

শিশুর মুখে চাষির বুকে
সাহস দিতে সেই সে শোকে
আবার দেখো উচ্চ শিরে
আঁধার চিরে আকাশ ঘিরে
সূর্যের তেজে মুজিব আসে
মুজিব আসে মুজিব আসে!

মুজিব আনে মুক্তি ও জয়
দেখো, এই বাংলা মুজিবময়।

## রেশমিরং রৌদ্রের চাদর

### দুখু বাঙাল

আগস্ট এলে আমাদের আকাশখানি বেশি বেশি মুখ ভার করে
আগস্ট এলে সন্তানের কথা বুঝি জনকের বেশি মনে পড়ে
আগস্ট এলে নক্ষত্রলোক থেকে ভেসে আসে পিতার চোখের জল
আগস্ট এলে বড়ো বেশি ফুঁসে উঠে আমাদের বঙ্গোপসাগর
আগস্ট এলে বাঙালির কারবালা দিকে দিকে স্মৃতি হয়ে উঠে
আগস্ট এলে আমাদের গায়ে উঠে পাঞ্জাতনি– কালো পাঞ্জাবি
আগস্ট এলে পিতৃত্বের শূন্যতা বুকে লয়ে সারা বাড়ি হাহাকার করে।

বসন্তের শুভক্ষণে এসেছিলে তুমি এই বেহুলা বাংলায়
অতঃপর বহুকাল লেগে থাকা ঝড়ঝঞ্ঝা রক্তনদী রক্তের সাঁতার
বার বার হাল ভাঙা, পাল ছেঁড়া উত্তাল নদীর যত ঢেউ
আর ঠিক মার্চেই সন্তানের হাতে তুমি দিয়ে গেলে মৌরসি দলিল
তবু এই আগস্টের ছাই, শোকাবহ কারবালার রক্তঝরা ধূলি
গায়ে মেখে আমরা সব পাথর ছুড়ি, গড়ে তুলি দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ
কেননা, এই আগস্টেই বার বার মাথা তুলে দাঁড়ায় শয়তান।

পিতা, তুমি এসেছিলে বলে সহসাই খসে গিয়ে জীর্ণ বস্ত্র সব
নতুন এক সূর্যোদয়ে আমাদের গায়ে উঠল রেশমিরং রৌদ্রের চাদর।

## তোমার কোনো প্রস্থান নেই

### আরিফ মঈনুদ্দীন

আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি নেমেছে, এ তো আগস্টের শুরু
কে বলেছে এ বৃষ্টির জল– এ তো শোকের অশ্রুধারা
ক্লান্তিহীন শোকগ্রস্ত মেঘের ক্রন্দন

পাহাড়ের বিরামহীন ঝরনার এ জল– এ যে জল মাত্র নয়
বিরামহীন শোকের মাতম
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, কে বলেছে তোমার প্রস্থান ঘটেছে ?
তুমি মিশে আছ আমার স্ফটিকস্বচ্ছ চরিত্রের সাথে
তুমি মিশে আছ আমার নিরবচ্ছিন্ন গতির সাথে
তুমি মিশে আছ আমার অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্যের সাথে
আমার স্বচ্ছতার সাথে তুল্যমূল্য শুধু তুমি– শুধু তুমি...

আগস্টের শুরু, পাখিরা শোকবার্তা বহন করে পৌঁছে দিচ্ছে
পৃথিবীর এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে
প্রকৃতির যত আছে তৃণমূল তরুলতা বৃক্ষরাজিতে সবুজ মাতম–
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, কে বলেছে তোমার প্রস্থান ঘটেছে ?
তুমি মিশে আছ আমাদের অকৃত্রিম সারল্যের সাথে
তুমি মিশে আছ তোমার স্বপ্নের স্বদেশ
সবুজ-শ্যামল এই বাংলার সাথে

আগস্টের শুরু, ফুলে-ফেঁপে উঠেছে পৃথিবীর তিন ভাগ জল
তাদের সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে নীল মাতম–
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, কে বলেছে তোমার প্রস্থান ঘটেছে?
তুমি মিশে আছ আমার উদ্দাম সাহসের সাথে
তুমি মিশে আছ আমার বিরামহীন বিলাপের সাথে
এবং আমি মিশে আছি তোমার সুনামির মতো বজ্রকণ্ঠের সাথে

তোমার কোনো প্রস্থান নেই, তুমি আছ চরাচরময়
প্রতিবছর আগস্ট আসে, এ তো শুধু আগস্ট নয়
এক অপার শক্তি– আমাদের শিক্ষা এবং দীক্ষা নেওয়ার সময়।

## মহাকালের চিঠিঃ প্রাপক বঙ্গবন্ধু

### আসলাম সানী

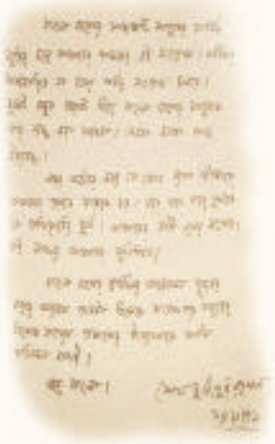

চিঠি পড়ছি মহাকালের মহা অবদানের
চিঠিখানা এক মহাকাব্য– আমার কোনো গানের
সুর ও মাত্রা-লয়ের
এই চিঠিই তো পলাশী থেকে একাত্তরের জয়ের,
পুণ্য গল্প-পুঁথি-পুরান-কালজয়ী উপন্যাস
বিশ্বের সব শোষিতের এক নন্দিত ইতিহাস,

চিঠির ভাষা মানবতার সংবেদনে মূর্ত
নির্বোধ ছাড়া দেশপ্রেমিকেরা তা পড়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত;

স্বাধিকার আর স্বাধীনতার শরিয়তউল্লাহ-তিতুমীরের
বিদ্যাসাগর-রামমোহন আর নেতাজীর উঁচু শিরের

ক্ষুদিরাম-সূর্যসেন-প্রীতিলতা সাহসিকা
এই চিঠি রক্তে আঁকা বীরত্বের জয়টিকা

বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি–এই ভূখণ্ডের মহামানব
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গৌরব–

লাল-সবুজের খামে–
এই চিঠি আছে দিগ্‌বিজয়ী-বাংলাদেশের মহান স্থপতি-অস্তিত্ব
শেখ মুজিবের নামে,

শ্রদ্ধাবনত চিত্তে লেখেন মার্শাল টিটো
চিঠির প্রাপক বাংলাদেশের নেতা অবিসংবাদিত

বুমেদিন-কেনেডি-সাদাতের চিঠি– 'ধন্য মুজিব ধন্য'
বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মহাকাল অনন্য–

ফিদেল ক্যাস্ত্রোর হিমালয় সনে
তুলনীয় মুজিব উদার মনে
থাকেন বিশ্ব জনগণে–

ইয়াসির আরাফাতও বলেন– হায়! বাঙালি হায়!
মুজিবের মতো বিশ্বে এমন নেতা কি পাওয়া যায়?

ইন্দিরা গান্ধী আর ব্রেজনোভ হতবাক
ম্যান্ডেলা বলেন, তৃতীয় বিশ্বে কে দেবে এমন ডাক–

কেমন আছেন টুঙ্গিপাড়ায় বাংলা মায়ের কোলে
কুশলাদি জানতে চিঠিটা আহা কান্নায় পড়ে ঢলে,

কেমন আছে বাংলার মানুষ? স্বাধীন বাংলাদেশ
দু'লোক-ভূলোক কাঁদে অনন্ত-শোকেই অনিমেষ

চিঠিখানা আজও বাংলার আকাশে
কেঁদে কেঁদে ফেরে আর মেঘে মেঘে সে ভাসে
শোকার্ত এই মাসে–

পদ্মা-মেঘনা-মধুমতীর ঢেউয়ের কলরোলে
কৃষক-শ্রমিক-বাউল-কবি মাটির বুকে ঢলে,
পশু-পাখি-বৃক্ষ দলে দলে–
তারই গুণকীর্তন গেয়ে চলে–
তীর্থভূমি টুঙ্গিপাড়ার পুণ্যসমাধিতলে–

চিঠিখানা বুঝি প্রাপকের আজ ঠিকানা খুঁজে পায়
ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের মানচিত্রটা হায়!
হু হু করে কান্নায়
চিঠির প্রাপক জাতির পিতা– বাহক আমার এটুকুই শুধু দায়।

## জাতির পিতার স্বপ্ন

### শাফিকুর রাহী

আগস্ট এলেই কেন মাগো শোক সংগীত গাও;
সন্তাপেরই বিলাপগাথা তোমরা শুনতে পাও!
পিতার নামে কাঁদতেও মানা স্বাধীন বাংলাদেশে
রক্তেভেজা প্রিয় স্বদেশ অনাথ এতিম বেশে–
সে নিদারুণ দুঃসহ রাত তিমিরঘেরা ত্রাসে–
শ্যামলিমা মাতৃভূমি শোক সমুদ্রে ভাসে।

সপরিবার পিতা হত্যার ভয়ানক পরিবেশ
পঁচাত্তরের মধ্য আগস্ট জ্ঞান হারালো দেশ।
থমকে দাঁড়ায় সব জনপদ স্তব্ধ শোকানলে–
হন্তারকরা সংঘবদ্ধ নানা মত ও দলে।
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠকাঁপে সূর্য গুটায় ডানা,
জয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু বলাও ছিল মানা।

সেদিন থেকে ভোর দেখেনি প্রাণের বাংলাদেশ,
বারুদবিহীন ট্যাংক কামানের ভয়ানক পরিবেশ।
এমনই এক দুর্বিষহ নিদারুণ কালবেলায়,
দুঃসংবাদে-হার্টঅ্যাটাকে কত যে প্রাণ হারায়!
গতি ও প্রগতি হারায় আপনহারার কালে
ভাটিয়ালি সুর বাজে না মাঝির নায়ের পালে।

মধ্য-আগস্ট কোন সে দস্যু কাড়ল মায়ের হাসি;
আলোকহারা বাতাস বাজায় শোকের করুণ বাঁশি।
ঘুমের ঘোরে ভাঙলো খোয়াব, শোক-তরণি বাহি;
পথের মাঝে পথ হারালো নগরকবি রাহী।
আগস্ট এলেই সব হারাবার বুকভাঙা মাতমে
মাফ করো দয়ালু মাবুদ জিকির দমে দমে।

ভয়াবহ কারবালাকাল মধ্য-আগস্ট মাসে
পিতার খুনে প্রাণের বাংলা রক্তগঙ্গায় ভাসে।
গভীর রাতে ডুকরে ওঠে স্বদেশের মানচিত্র
দেশের দুশমন এক হয়ে যায় শত্রু এবং মিত্র।
সত্য সঠিক ইতিহাসও বলতে ভীষণ বাধা,
পরাজিত দেশদ্রোহী ওরা হলো গাধা।

ওরা আজও শয়তানি চাল দেশ-বিদেশে চালে
অপকর্মের অপরাধে হাতকড়া কপালে!
সারাজনম শোকসমুদ্রে এ জাতিটা ভাসবে;
সন্তাপেরই দাহ ভুলে কেমন করে হাসবে!
জাতির পিতার স্বপ্ন সফল করতে সবাই আসো
সব ভেদাভেদ বিভেদ ভুলে দেশকে ভালোবাসো।

## তর্জনীর স্পর্ধিত অহংকার

### অনিকেত শামীম

কত আর অন্ধকারে যেতে পারো তুমি বাংলাদেশ!
তোমার তো রয়েছে গৌরবগাথা
আলোকোজ্জ্বল রৌদ্রের অমা
স্পর্ধিত অহংকারে একটি তর্জনী
আমাদের জাগিয়ে তোলে, সাহস জোগায়।

বাংলার জল মাটি কাদায় বেড়ে ওঠা
একজন মহামানব আমাদের মুক্তির দিশারি
তোমার বজ্রনিনাদ কণ্ঠ এখনো
বাংলার আকাশে-বাতাসে ঘুরে বেড়ায়,
জীবনের রূঢ় গোপনতায় যখন নিষ্পলক চোখ জলে ভিজে যায়
তখন মহাকাশব্যাপী তোমার সেই বজ্রনিনাদ কণ্ঠ
দিগন্তের প্রচ্ছদ মাড়িয়ে আমাদের সচকিত করে তোলে
আমরা বুকটান করে উঠে দাঁড়াই
আর ধুলো-মাটির সংসারে ছিন্নভিন্ন বসন্তের পঙ্‌ক্তি সাজাই।

কত আর অন্ধকারে যাবে তুমি বাংলাদেশ!

জীর্ণ করোটিজুড়ে বিষণ্নতার বিষবৃক্ষ ছেয়ে আছে
সবখানেই বাসা বেঁধেছে ফণাতোলা বিষাক্ত সাপ
আমাদের মানচিত্র ঠুকরে ঠুকরে যাচ্ছে ধূর্ত খাটাশ
হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে গর্বিত পতাকা

না, এভাবে সমূহ-বিনাশের দিকে যেতে পারো না বাংলাদেশ!

পাঠ নাও বাংলার সাফল্যগাথা,
একটি তর্জনীর ইশারায় কীভাবে জেগে উঠেছিল
গ্রামবাংলার জনপদ, পাঠ নাও–
সেই বজ্রনিনাদ আর তর্জনীর স্পর্ধিত অহংকারে
হেসে উঠবে তুমি বিশ্বসভায়, আমার বাংলাদেশ।

## শ্রাবণ

### আরিফ নজরুল

শ্রাবণ বৃষ্টি চোখ ছলছল মেঘ সরোবর
বত্রিশ সড়কে ভেজা কবুতর কাঁদে
সরোবরে মাছের সাঁতার জলের উপরে আসা
অভুক্ত মাছেরা কাঁদে তাঁর জন্য।

আঙুলের ইশারায় জেগে উঠেছিল জনতা
সাত কোটি বাঙালি মুক্তির দাবি নিয়ে
তিনি রেখে গেলেন তাঁর অমর মুক্তিসনদ
বুকে আগলে রাখি পিতা, প্রাণের মতন।

প্রার্থনারত পাখিরা তোমার গান গায়
কৃতজ্ঞতায় ভালোবাসায় নোনাজল কপোলে
স্বপ্নে দেখি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলে গেলে
অপ্রকাশিত কিংবা প্রকাশিত কথামালা
যেন পথ চলি সাহসে নির্ভয়ে।

পিতা আমার বাঙালি জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু তোমার সমুজ্জ্বল সমগ্র জীবন
পাঠে শ্রাবণে ভাসি বারো মাসই
বাঙালির কি উৎসব আছে, থাকতে নেই
ঘাতকেরা নিয়ে গেছে সমস্ত পার্বণ!

## মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর

### খান আসাদুজ্জামান

তুমি ক্ষণজন্মা
তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর
তুমি বাংলার জমিনে চিরবৈশাখি
বাংলার আকাশে প্রোজ্জ্বল জ্যোতি
তুমি সুশীতল ছাড়া সুনিবিড়।

তুমি ক্ষণজন্মা
তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর
তুমি মাতৃভাষার সাক্ষাৎযোদ্ধা
তুমি একাত্তরের চিরঅম্লান ইতিহাস
তুমি বাংলার চিরউন্নত শির
তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর।

তুমি ক্ষণজন্মা' হে মহান
তুমি বঙ্গের অহংকার
তুমি শাশ্বত সুন্দর
তুমি শতাব্দী হতে শতাব্দীতে
চির ভাস্বর
তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর।

তুমি এসেছ এ-বঙ্গে বীররূপেই
তুমি জন্মেছো এ-বঙ্গে কাণ্ডারি বেশে
তুমি লোকান্তরিত হলেও
তুমি চিরঞ্জীব
চিরকালের তুমি
তর্জনী উঁচানো এক দরাজ কণ্ঠের
আবাহনী তেজোদীপ্ত সুপুরুষ।

এ বাংলার সকল মানুষের
হৃদয় অলিন্দে
তোমার ক্ষয় নেই, তোমার ভয় নেই
তুমি ক্ষণজন্মা
তুমি এক মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর॥

## ক্ষমা করে দিও পিতা

### দিলরুবা শাহাদৎ

শ্রাবণের দুঃসহ যাতনাময় সেই কালরাত্রি ফিরে আসে
রক্তমাখা রাত আজও প্রবাহিত হতে থাকে
নক্ষত্রেরা নিভে যায়, বাতাস আহত হয়
পিতা! সেই দুঃখ নিয়ে অবনত অপরাধী আমরা এখনো।

তোমার উদাত্ত ডাকে জেগেছে বাঙালি, মুক্তিযুদ্ধ,
স্বাধীনতা এই জাতিসত্তা– সবই তো দিয়েছ পিতা।
তবু সেই স্বাধীন স্বদেশে রক্ষা করতে পারিনি তোমায়!
সেই রাতে হারিয়েছি তোমার প্রেরণা বঙ্গমাতা,
হারিয়েছি পরম স্নেহের পুত্র-পুত্রবধূদের!
তোমার প্রাণের প্রিয় শিশু রাসেলের শেষকান্না
আগস্টের বৃষ্টিভেজা বাতাসে ভাসছে আজও।

তোমার বাড়ির রক্তেভেজা মেঝেতে, দেয়ালে আজও
সেই কান্না শুনি, ভেজা ফুলগুলো ঝরে পড়ে শোকে
প্রকৃতি নিস্তব্ধ শোকে পাথর প্রতিমা।
আমাদের চরম ব্যর্থতা ক্ষমা করে দিও পিতা!

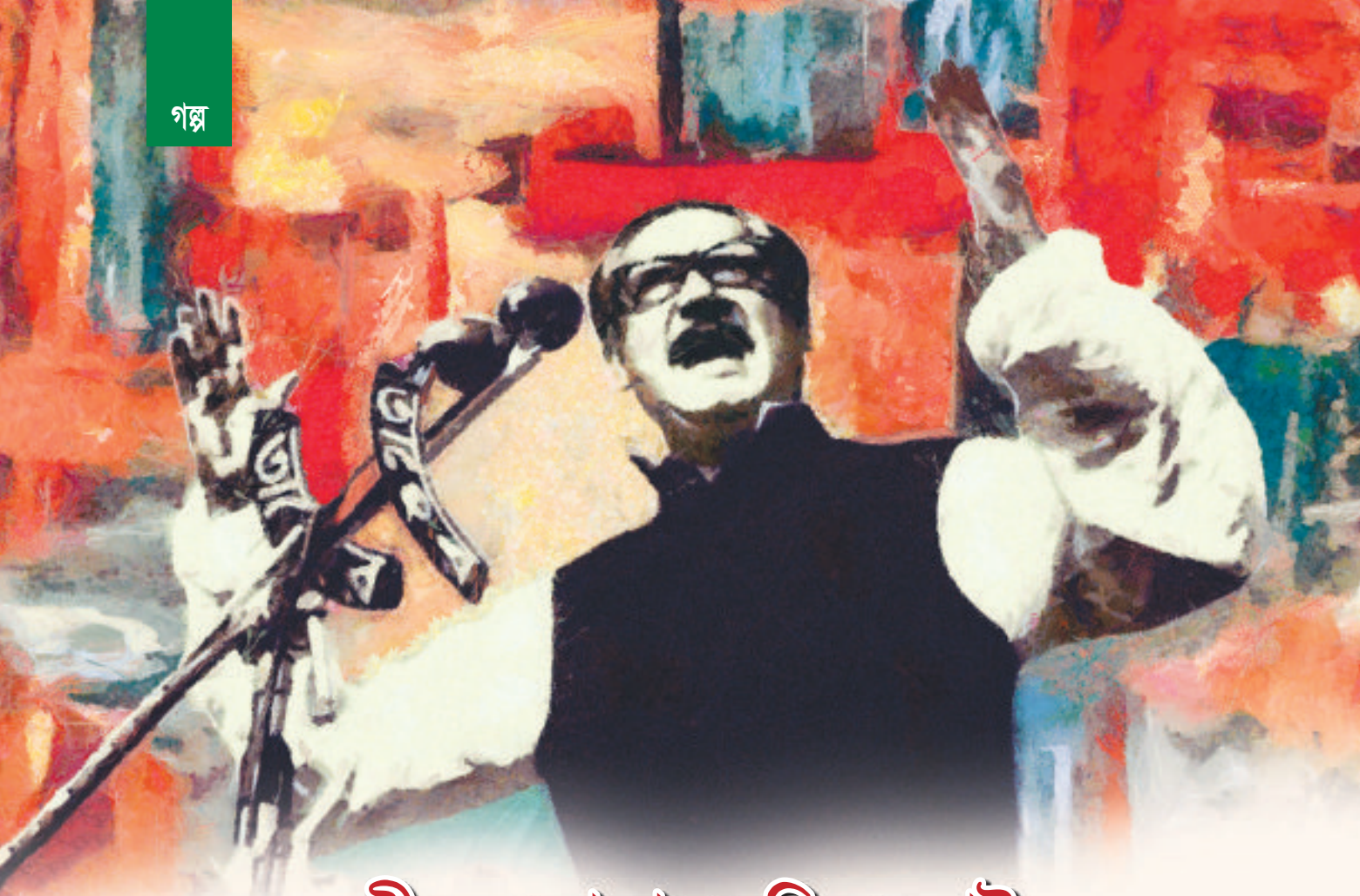

# ধীরেন কাকার মুজিব কোট

সুজন বড়ুয়া

আজ ১৫ই সেপ্টেম্বর। ঠিক এক মাস পর আজ প্রথম বাড়ি থেকে বের হলেন ধীরেনকা।

এক মাস আগে ১৫ই আগস্ট ভোররাতে ঘটে গেছে ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি। ঢাকার ধানমন্ডিতে নিজ বাসভবনে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

অভাবনীয় অবিশ্বাস্য এ ঘটনা। প্রথম শুনে বিশ্বাসই করতে পারেননি ধীরেনকা। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো প্রাতঃকর্ম সেরে সেদিনও ভোর ছয়টায় রেডিও ছেড়েছিলেন খবর শোনার জন্য। কিন্তু রেডিও অন করতেই শোনা গেল– 'আমি মেজর ডালিম বলছি, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে।' এটুকু শুনেই সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন ধীরেনকা।

একি উদ্ভট সংবাদ! একি সত্য? ধীরেনকা ঝটপট রেডিওর নব্ ঘুরিয়ে ভয়েস অব আমেরিকা ধরেছিলেন। সেখানেও একই খবর। এরপর বিবিসি, তারপর ধরেছিলেন আকাশবাণী কলকাতা। সেখানেও মেজর ডালিমের বরাত দিয়ে বলা হচ্ছিল, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে।

বজ্রাহতের মতো বসে পড়েছিলেন ধীরেনকা। বুক-গলা শুকিয়ে উঠেছিল তার। হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসছিল ক্রমে। একি শুনছি! এও কি সম্ভব! যে মানুষটা দেশের স্বাধীনতার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করলেন, শেষ পর্যন্ত স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করলেন, দেশের মানুষ যাকে ভালোবেসে জাতির পিতা হিসেবে বরণ করে নিয়েছে, তাঁর এই পরিণতি! এই হীন কাজ কী করে ওরা করতে পারল?

হাঁসফাঁস করতে করতে চেয়ার থেকে আবার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ধীরেনকা। স্ত্রীকে এক গ্লাস খাবার জল দিতে বলে ধীর পায়ে এগিয়ে ছিলেন সামনে। বারান্দায় আসতেই দেয়ালে টাঙানো বঙ্গবন্ধুর ছবিটার ওপর চোখ আটকে গিয়েছিল তার। ফুল ফ্রেমে বাঁধানো বঙ্গবন্ধুর বড়ো ছবি। ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে হাতকাটা কালো কোট পরা, ঘাড়ের দুদিক থেকে বুকের ওপর দিয়ে উত্তরীয় ঝোলানো। কী তেজোদীপ্ত পুরুষ! কী সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব! এই মানুষকে নাকি হত্যা করা হয়েছে! কেউ এই মানুষকে হত্যা করতে পারে?

স্ত্রী গীতাদেবী ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তার হাতে জলভরা গ্লাস। বলেছিলেন, রেডিওতে কী বলছে এইসব!

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে দুলতে দুলতে ঢকঢক করে গ্লাসের জলটুকু পান করেছিলেন ধীরেনকা। তারপর বলেছিলেন, শোনো না, কী সব উদ্ভট কথা, বঙ্গবন্ধুকে নাকি হত্যা করা হয়েছে।

– ওমা, একি অলক্ষুণে কথা! এমন পাপ কাজ কেউ করতে পারে! কোন নরপশু এই কাজ করল?

গীতাদেবী আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে খালি গ্লাসটা নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গিয়েছিলেন ভেতরের ঘরে।

রেডিওতে কাজী নজরুল ইসলামের 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' গানের যন্ত্র সংগীত বাজছিল। আর খানিক পর পর প্রচার হচ্ছিল সেই মর্মভেদী দুঃসংবাদ। কিছুক্ষণ পর খবরে জানা গেল, খোন্দকার মোশতাক আহমদকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ধীরেনকা রেডিও থেকে কান সরিয়ে আবার চোখ ফিরিয়েছিলেন দেয়ালের ছবিটার ওপর। ছবির এই মানুষটা কী সম্মোহন জাগিয়ে ছিলেন ১৯৭১ সালে। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে কথার জাদু আর অনন্য ভঙ্গিমায় উজ্জীবিত করেছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে। ধীরেনকাও তার একজন সাক্ষী। চোখের পর্দায় মুহূর্তেই ভেসে উঠল সেসব স্মৃতি।

ধীরেনকা মানে ধীরেন্দ্র কাকা। ধীরেন্দ্র বড়ুয়া। পাড়ার লোকদের মুখে মুখে ধীরেন্দ্র কাকা হয়ে গেছে ধীরেনকা। ধীরেনকা এখন চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার ছিলোনিয়া গ্রামে নিজ বাড়িতে থাকেন। ১৯৭১ সালে ছিলেন ঢাকায়। কাজ করতেন আয়ুর্বেদীয় ঔষধ উৎপাদনকারী বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান সাধনা ঔষধালয়ে। কলকাতা আয়ুর্বেদীয় কলেজ থেকে আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষে যোগ দিয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে। সাধনা ঔষধালয়ের মালিক যোগেশচন্দ্র ঘোষের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন ধীরেনকা। যোগেশচন্দ্র তার ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধ উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ধীরেনকাকে।

ধীরেনকা সে সময় পরিবার নিয়ে থাকতেন ঢাকায়। এক ছেলে এক মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে চার জনের সংসার তার। ছেলে সুমিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ুয়া আর মেয়ে জয়তী ক্লাস এইটের ছাত্রী। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর একাত্তর সালের শুরুতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকলে ছেলে-মেয়ে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গ্রামের বাড়িতে। ধীরেনকা নিজে একা থেকে গিয়েছিলেন ঢাকায়।

৭ই মার্চের রেসকোর্স ময়দান অনেকের মতো হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল পঞ্চাশোর্ধ্ব ধীরেনকাকেও। ভেতরের স্রোত তাকে নিয়ে হাজির করেছিল উন্মাতাল রেসকোর্স ময়দানে। বঙ্গবন্ধুর সেদিনের বাক্‌ভঙ্গি ধীরেনকাকে আকৃষ্ট করেছিল চুম্বকের মতো। সাদা ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর হাতকাটা কালো কোট পরা বঙ্গবন্ধুর পৌরুষদীপ্ত অদম্য মূর্তি সেদিন ধীরেনকার মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল চিরকালের জন্য। সেটা দিন দিন উজ্জ্বলতর হয়েছে আরও।

২৫শে মার্চ রাতে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধু বন্দি হলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে। শুরু হলো সারা দেশে নির্বিচার নিরীহ বাঙালি নিধন। ৪ঠা এপ্রিল বর্বর হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর হাতে নিহত হলেন যোগেশচন্দ্র ঘোষ। ধীরেনকা এসময় ঢাকা ছেড়ে কুমিল্লা হয়ে চলে গেলেন ভারতে। আগরতলার মেলাগড় ট্রেনিং সেন্টারে যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে গিয়ে ছেলে সুমিতের সঙ্গে দেখা। সুমিত বাড়ি থেকে এসে আগেই যোগ দিয়েছে ট্রেনিংয়ে। ট্রেনিং শেষে পিতা-পুত্র একসঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে।

দেশ স্বাধীন হলো। বঙ্গবন্ধু তার স্বপ্নের স্বদেশে ফিরে এলেন। ডুব দিলেন দেশ গঠনে। কিন্তু ধীরেনকার ঢাকায় ফিরে যেতে ইচ্ছে হলো না আর। যোগেশচন্দ্র ঘোষ নেই, ঢাকায় গিয়ে আর কী হবে? গ্রামের বাড়িতে থেকে নিজেই তিনি শুরু করলেন আয়ুর্বেদীয় ঔষধ উৎপাদন। চেম্বার করার জন্য দোকান নিলেন গ্রামের বাজার বিবির হাটে। রোগী দেখা আর ওষুধ বিক্রি দুটোই চলে তার চেম্বারে। ছেলে সুমিত এরইমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে স্কলারশিপ নিয়ে চলে গেছে রাশিয়ায়। বিয়ে হয়ে গেছে মেয়ে জয়তীরও। বাড়িতে এখন মানুষ শুধু দুজন, ধীরেনকা আর তার স্ত্রী গীতাদেবী।

সকাল দশটার দিকে খেয়েদেয়ে ধীরেনকা চলে যান বাজারের চেম্বারে। বাড়ি থেকে দুই মাইল দূরে বাজার। পায়ে হেঁটে নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন ধীরেনকা। মুক্তিযোদ্ধা মানুষ, বয়স যদিও এখন পঞ্চান্ন, দু'চার মাইল পথ পায়ে হাঁটা তার জন্য নস্যি। গায়ের বল মনের জোর দুটোই তার এখনো সমান অটুট।

গ্রামে থাকলেও দেশের সব খবর রাখেন ধীরেনকা। চেম্বারে রোগী দেখার ফাঁকে খবরের কাগজ পড়েন নিয়মিত। সকালে আর রাতে রেডিওতে খবর শোনা তার অনেক দিনের অভ্যেস। বঙ্গবন্ধুর দেশ গঠনের কর্ম-পরিকল্পনা দেখে অবাক হয়ে যান ধীরেনকা। তারই বয়সি একজন মানুষ কী অসামান্য দক্ষতায় ছন্নছাড়া দুর্ভাগা বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার কবল থেকে উদ্ধার করেছেন, আবার তাদের দেখাচ্ছেন উন্নত জীবনের স্বপ্ন। কৃষক, শ্রমিক, দীন-দরিদ্র, নিরন্ন মানুষের জীবনের মানোন্নয়নই তার প্রথম ও প্রধান কাজ। ধর্ম-বর্ণের কোনো ভেদাভেদ নেই তার কাছে, মানুষই তার কাছে বড়ো। তিনি বলেন, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবাই আমরা বাঙালি। দেশে দুর্নীতিমুক্ত ও শোষণমুক্ত প্রগতিশীল সমাজ গঠন করতে হবে।

কী উদার রাজনৈতিক চিন্তা! মুগ্ধতায় ভরে আসে ধীরেনকার দু'চোখ। শুধু আদর্শের দিক থেকে নয়, বাহ্যিক পোশাকেও তিনি গ্রহণ করলেন বঙ্গবন্ধুকে, ধারণ করলেন ভেতরে বাইরে দুভাবেই। স্বাধীনতার পর থেকে বঙ্গবন্ধুর মতো পোশাক পরতে শুরু করলেন তিনি। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে হাতকাটা কালো কোট। ভর গরম কালের কয়টা দিন বাদ দিয়ে প্রায় সারা বছরই তিনি পরেন এই কোট। সদ্য-স্বাধীন দেশ, বয়স্ক এক মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবন্ধুর মতো পোশাক পরেন, মানুষের চোখে তা বেমানান ঠেকবে কেন? ক্রমে তাকে এ পোশাকে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠল এলাকার সবাই। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সবাই সম্মান ও সমীহের চোখে দেখে তাকে। অন্তত এতদিন তা-ই দেখে এসেছে।

কিন্তু আজ? এখন কী হবে? যাকে স্বপ্নের পুরুষ বলে গ্রহণ করেছিলেন ধীরেনকা, সেই প্রাণপ্রিয় মানুষটিকে অতর্কিতে হত্যা করা হলো হঠাৎ, তা কি মানা যায়? পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালে যাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেও তা কার্যকর করতে পারেননি, স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁরই হাতে গড়া সেনাবাহিনীর কয়েকজন মাত্র সদস্য তাঁকে হত্যা করল, একি মানা যায়? না, কিছুতেই না। অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হতে থাকেন ধীরেনকা। কার কাছে এই মর্মবেদনা জানাবেন, বিচার চাইবেন কার কাছে? দেশে এমন কেউ কি আছে? ভেতর থেকে তিনি উত্তর পান, না নেই, কেউ নেই। সবাই পালটে গেছে কেমন! সবাই নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পরই তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী মন্ত্রিসভার সদস্য খোন্দকার মোশতাক আহমদ হয়েছেন প্রেসিডেন্ট। এ কেমন গোপন ষড়যন্ত্র! বঙ্গবন্ধুর সহযোগীদের অনেককে পোরা হয়েছে জেলে। আত্মগোপনে থেকে আত্মরক্ষার পথ বেছে নিয়েছে কেউ কেউ। এ কেমন বৈরী সময়!

একা একা চুপচাপ বসে থাকেন ধীরেনকা। ঘরের বাইরে যান না কোথাও। না গ্রামের পথেঘাটে, না বাজারে, না চেম্বারে। সারাদিন ঘরে বসে শুধু রেডিও শোনেন। আকাশবাণী কলকাতা, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা আর বাংলাদেশ বেতার, যা এখন রেডিও বাংলাদেশ নামে প্রচারিত হয়। কী আশ্চর্য! কীভাবে দ্রুত বদলে যাচ্ছে সব। ঘরে বসে অক্ষম ক্ষোভে জ্বলে পুড়ে মরতে থাকেন মুক্তিযোদ্ধা ধীরেনকা। দিনের পর দিন, এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ। তারপর একদিন ভেতরের চাপটা হঠাৎ যেন দলা পাকিয়ে ওঠে ধীরেনকার। না, এটা হতে পারে না। বঙ্গবন্ধুকে কেউ কাপুরুষের মতো হত্যা করতে পারে, কিন্তু তাঁর আদর্শকে তো হত্যা করতে পারে না। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, একজন বাঙালি বেঁচে থাকতে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ হতে দেবে না। তাহলে একজন মুক্তিযোদ্ধা, একজন ধীরেন্দ্র বড়ুয়া বেঁচে থাকতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ কি নস্যাৎ হতে পারে? না, হতে পারে না। ধীরেনকা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, অন্তত আমি তা হতে দেব না। যা-ই হোক, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ভেতরে বাইরে একাই ধরে রাখব আমি, আমি চলব আমারই মতো।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ঠিক এক মাস পর আজ প্রথম বাড়ি থেকে বের হলেন ধীরেনকা। পরনে তার সেই চিরাচরিত পোশাক– সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, তার ওপর বঙ্গবন্ধুর মতো হাতকাটা কালো কোট, পায়ে রাবারের পাম্পসু। ডানহাতে ঝুলিয়ে ধরা ডাক্তারি সরঞ্জামের কালো ব্যাগটা। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ধীর পায়ে এগিয়ে চললেন তিনি। আজ তিনি বাজারে যাবেন, চেম্বার খুলে বসবেন আগের মতো।

বাইরে ভেজা বাতাস বইছে। রাতে ভারি বৃষ্টি হয়েছে। আকাশ এখনো মেঘলা, তবে বৃষ্টি নেই। গ্রামের কাঁচা রাস্তাটা সাবধানে পেরিয়ে ইট বিছানো বড়ো রাস্তায় উঠে এলেন ধীরেনকা। সকাল দশটা। চৌপথের দুটো দোকানই বন্ধ। পথেঘাটে লোকজন তেমন নেই। অল্প বয়সি একটি ছেলে সাইকেল চালিয়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতে সালাম দিল ধীরেনকাকে। মাথা দুলিয়ে সালাম গ্রহণের ভঙ্গি করে আপন মনে এগিয়ে চলেন ধীরেনকা।

ধুরং নদীর ব্রিজের ওপর উঠে দাঁড়ান একটু। নিচে তাকিয়ে দেখেন পাহাড়ি ঘোলাজল ঘূর্ণিপাকে গড়িয়ে যাচ্ছে দক্ষিণে। নদীর ঘোলাজল দেখে বাংলাদেশের রাজনীতির কথাই হঠাৎ মনে এল ধীরেনকার। রাজনীতির এই ঘোলাজলে কে যে মাছ শিকারে বসেছে কে জানে!

ফটিকছড়ি কলেজের সামনে রাস্তার দুপাশে দোকানগুলোর অনেক কয়টাই বন্ধ। মাঝে মধ্যে দু'একটা খোলা। লোকজন তেমন নেই। দোকানিদের অলস এলানো ভাব। এখান থেকেই নতুন বাজার শুরু। ধীরেনকা কারো দিকে না তাকিয়ে এগোতে থাকেন সামনে।

কলেজ থানা ছাড়িয়ে এসে গোষ্ঠ পালের হোমিও হল। গোষ্ঠ পাল প্রবীণ হোমিওপ্যাথ। বয়সে ধীরেনকার চেয়ে কিছুটা বড়ো। তবু চিকিৎসা পেশার নৈকট্যের কারণে ধীরেনকার বিশেষ বন্ধু। হোমিও হলের সামনে এসে সেদিকে তাকান ধীরেনকা। হোমিও হল খোলা এবং গোষ্ঠ পাল চেম্বারে বসা। রোগী ক্রেতা তেমন নেই। অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্যামল মৈত্র আর একজন অচেনা লোক সামনে বসা।

ধীরেনকা ভেতরে ঢোকেন।

– নমস্কার দাদা, কেমন আছেন?

গোষ্ঠ পাল ধীরেনকার দিকে তাকিয়ে যেন একটু বিব্রত। এই পোশাকে আজ ধীরেনকাকে আশা করেননি তিনি। তবু ধীরেনকাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ম্লান হাসেন গোষ্ঠবাবু। নিম্নস্বরে বলেন, বসুন না।

অচেনা লোকটা থেকে একটু দূরের চেয়ারে বসেন ধীরেনকা। গোষ্ঠবাবু দ্রুত বিদায় করেন লোকটাকে। লোকটা চলে যাওয়ার পর হতাশ সুরে বলেন, থেকে আর কী হবে মশাই। সব তো শেষ হয়ে গেল। এ ঘটনা যে কীভাবে ঘটাল!

– ষড়যন্ত্র, দাদা সব ষড়যন্ত্র। দালালরা আর বিশ্বাসঘাতকরা সব এক হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর উদারতা ও মানুষের প্রতি অন্ধবিশ্বাসই কাল হলো। বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ধীরেনকা।

গোষ্ঠবাবু এবার বলেন, আমরা মার্কামারা বঙ্গবন্ধুপ্রেমী, এখন আমাদেরই তো বড়ো সমস্যা। কোথাকার জল কোথায় যে গড়ায়! সে যা-হোক, আপনাকে যে কদিন দেখিনি।

ধীরেনকা গোষ্ঠবাবুকে বোঝার চেষ্টা করেন। গোষ্ঠবাবু সতর্ক মানুষ। মনে হলো, বঙ্গবন্ধু হত্যার ঘটনাটা তিনি সামলে নিয়েছেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। হায়, মানুষ কত সহজে সব মেনে নিতে পারে! ভাবতে ভাবতে ধীরেনকা বলেন, হ্যাঁ, আমার একটু সময় লাগল সামলে উঠতে। আজ ঠিক এক মাস পর বাড়ি থেকে বের হলাম।

গোষ্ঠবাবু এবার বলেন, আপনার ব্যাপারটা আমি বুঝি। আপনি ডাইরেক্ট ফাইটার। কিন্তু এখন তো পরিস্থিতি ভিন্ন। এখন আপনার একটু বুঝেশুনে-রয়েসয়ে চলা উচিত।

গোষ্ঠবাবুর ইঙ্গিতটা বুঝতে এবার সময় লাগে না ধীরেনকার। বলেন, কেন দাদা, আপনি আমার পোশাক-আশাকের কথা বলছেন?

– সেটাও বটে, পোশাকের বিষয়টাও তো এখন আপনার একটু আমলে নেওয়া দরকার।

– দাদা দেখুন, একটা মানুষ সারাজীবনের সাধনায় দেশটা স্বাধীন করলেন, তাঁকে হত্যা করলেই সব শেষ হয়ে যাবে? হন্তারক ষড়যন্ত্রকারীদের ভয়ে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন জীবনশৈলী সব ত্যাগ করতে হবে? আমি যে এটা পারব না দাদা। বলতে বলতে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ধীরেনকা। নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে।

বাজারের দক্ষিণ পাশে ধীরেনকার চেম্বার। গোষ্ঠবাবুর হোমিও হল থেকে বেরিয়ে বাজারের মাঝখান দিয়ে সোজা পথ ধরেন তিনি। দুপাশ থেকে অনেকে তাকিয়ে দেখছে তাকে। তিনি এগিয়ে চলেন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ধীর পায়ে। তেপথে এসে মোড় নেন পূর্ব দিকে। পূর্ব-পশ্চিম লম্বা এ রোডেই উত্তরমুখী তার চেম্বার। আশপাশে অনেক দোকানপাটই এখনো বন্ধ।

ধীরেনকা দোকান খুলে ঝাড়পোঁছ করে বসেন চেম্বারে। বাজারে লোকজন খুব কম। অনেকক্ষণ পর একজন দুজন দেখা যায়। সবাই কেমন ছাড়া ছাড়া। কোনো রোগী ক্রেতার দেখা তেমন মেলে না। চেম্বারে বসে বসে খবরের কাগজ পড়তে চেষ্টা করেন ধীরেনকা। কিন্তু সব খবরই হতাশাজনক। পড়তেও ভালো লাগে না। কোনোমতে বিকেলটা কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে আগে চেম্বার বন্ধ করে বাড়িমুখো হলেন ধীরেনকা।

এভাবেই চলে প্রতিদিন। একই পোশাকে একই নিয়মে চেম্বারে আসেন, সারাদিনে দু'একটা রোগী এলে দেখেন, নয়তো নয়, খবরের কাগজ পড়েন। তারপর সন্ধ্যার আগে আগে বাড়ি ফিরে যান ধীরেনকা। আসা-যাওয়ার পথে মানুষজন যেন কেমন কেমন করে তার দিকে তাকায়। ধীরেনকা সবই বোঝেন, কিন্তু গায়ে মাখেন না কিছুই। ভেতরে যা-ই হোক, বাইরে তার ভাবডাঁট এমন, যেন কিছুই হয়নি দেশে, সব আগের মতো আছে।

এরইমধ্যে ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক আহমদ জারি করেন ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ- ১৯৭৫। এ আদেশের অর্থ বঙ্গবন্ধু হত্যার কোনো বিচার করা যাবে না। কী নিষ্ঠুর বর্বরতা! দেশের স্বাধীনতার মহানায়ককে সপরিবারে হত্যা করা হলো। তাঁর কোনো বিচার হবে না। একি অসভ্যতা! একা একা তড়পাতে থাকেন ধীরেনকা। ৩রা নভেম্বর রাতে জেলখানায় ঘটানো হলো আরও একটি জঘন্য ঘটনা। হত্যা করা হলো বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার নেতাকে। তাঁরা হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান। এর পেছনে উদ্দেশ্য কী, কী চায় হত্যাকারীরা? কিছুই ভেবে পান না ধীরেনকা।

কিছুদিনের মধ্যেই দেশের শাসন ক্ষমতায় নতুন ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতদিন সব চলছিল সামরিক বাহিনীর ছত্রছায়ায়। দেশে কথা বলার কেউ নেই। বঙ্গবন্ধুর পর প্রধান চার নেতাকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে চিরতরে। কোনো রাজনৈতিক দল নেই, যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ। সুতরাং পথ এখন নিষ্কণ্টক। এবার দেশের শাসনভার সম্পূর্ণ চলে গেল সেনাবাহিনীর দখলে। দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন জিয়াউর রহমান। এক বছরের মাথায় উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থেকে তিনি হয়ে বসলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং প্রেসিডেন্ট। গণভোটের মাধ্যমে পাকা করে নিলেন নিজের আসন। প্রহসন কাকে বলে! বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করা হলো বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে পদায়নের মাধ্যমে। ধীরেনকা চুপচাপ সব দেখেন, শোনেন আর মর্মে মর্মে জ্বলতে থাকেন। হায় আমার দেশ, বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী উদার প্রগতিশীল অভিযাত্রায়

যার আকাশ ছোঁবার কথা ছিল, সে আটকে গেল সীমিত বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে। হায় মুক্তিযুদ্ধ, হায় আমার অদৃষ্ট। একা একা শূন্যে মাথা কুটতে থাকেন ধীরেনকা।

কদিন যেতে না যেতে দেখা গেল বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে তারুণ্যের জোয়ার। শহর-গঞ্জ-গ্রাম-পাড়া-মহল্লায় তরুণ জোয়ানদের নতুন উদ্যম, নতুন প্রাণচাঞ্চল্য। নতুন রাজনীতির ছায়ায় দেশীয় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলবে তারা। ক্রমেই মেতে ওঠে গানবাজনা নাটক নানা অনুষ্ঠান আয়োজন ও আনন্দ উল্লাসে।

আস্তে আস্তে নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করেন ধীরেনকা। সবকিছু মেনে নিয়ে ডুব দেন নিজের কাজে। বাড়িতে মাসে দু'একবার চ্যবনপ্রাশ, মোদক, শালশা ইত্যাদি উৎপাদন করেন। দিনের বেলা চেম্বারে বসে রোগী দেখেন আর ওষুধ দেন। এভাবেই ব্যস্ততার মধ্যে দিন কেটে যায় তার।

একদিন দুপুরবেলা। ধীরেনকা তার চেম্বারে বসে আছেন একা। অল্প বয়সি একটি ছেলে এসে উপস্থিত। আঠারো-উনিশ বছর বয়স হবে ছেলেটির। সালাম দিয়ে মিষ্টি হেসে ছেলেটি বলে, কাকা, আমাকে চিনতে পারছেন? আমার বাড়ি আপনাদের কাছেই। আমি মুন্সী বাড়ির জয়নালের ছেলে বেলাল।

ধীরেনকা বলেন, ও আচ্ছা, তোমার বাবাকে তো চিনি। তা তুমি কী করো?

– কাকা আমি ফটিকছড়ি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি।

– বাহ বাহ, বেশ, মন দিয়ে পড়াশোনা করো। ধীরেনকা খুশিমনে বলেন।

বেলাল মৃদু হেসে হেসে মাথা চুলকায়। তারপর বলে, কাকা, একটা কথা বলতাম।

– বলো, বলো, এত সংকোচ কীসের? ধীরেনকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেলালের দিকে তাকান।

বেলাল এবার বলে, কাকা, আমরা কলেজে নানা অনুষ্ঠান করি। আগামী ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমাদের একটা নাটকের অনুষ্ঠান আছে। সেখানে পার্ট করার জন্য একটা মুজিব কোট দরকার। আপনার কোটটা যদি একদিনের জন্য আমাদের দিতেন। পরদিন আবার ফেরত দিয়ে যাব কাকা।

ধীরেনকা অপ্রস্তুত। এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হবে কোনোদিন ভাবেননি। নাটকের জন্য বলছে, কোটটা না দিলে কেমন দেখায়। কিন্তু ছেলেটাকে তো ভালো চিনি না। তার বাবাকে অবশ্য চিনি। আমার বাড়ির কাছে বাড়ি। না করে ফিরিয়ে দিলে কী ভাববে? ধীরেনকা আমতা আমতা করতে করতে বলেন, নাটকের জন্য নেবে?

বেলাল হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ায়।

ধীরেনকা বলেন, আচ্ছা নিও। কোনদিন লাগবে?

– ২৬শে মার্চ আমাদের নাটক তো। ২৫ তারিখ বিকেলে দিলে হবে। ২৭ তারিখ দিয়ে যাব কাকা।

বেলাল হাসিমুখে সালাম দিয়ে বিদায় নেয়।

২৫শে মার্চ বিকেলে ধীরেনকার চেম্বারে এসে কোট নিয়ে গেল বেলাল। কিন্তু ২৭ তারিখ কোট ফেরত দিয়ে গেল না আর। ধীরেনকা ভাবনায় পড়ে গেলেন এবার। সবাই জানে এ কোট আমার আদর্শের প্রতীক। তাই ছেলেটা কি ভাওতা দিয়ে কোটটা নিয়ে গেল? কী করবেন, কাকে বলবেন ভেবে পেলেন না ধীরেনকা।

সেদিন সন্ধ্যায় বাজার থেকে ফিরছিলেন ধীরেনকা। পথে বেলালের বাবা জয়নালের সঙ্গে দেখা। একথা-সেকথা বলে সাধারণ কুশল বিনিময়ের পর ধীরেনকা বলেন, আচ্ছা জয়নাল, তোমার ছেলে বেলাল কলেজে পড়ে না?

জয়নাল বলে, হ্যাঁ দাদা, পড়ে তো।

– বেলাল গত ২৫ তারিখ বিকেলে আমার গায়ের কোটটা চেয়ে নিয়ে গেল। বলল, ওদের কলেজের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসের নাটকে পার্ট করার জন্য এই কোট ওদের দরকার। ২৭ তারিখ ফেরত দিয়ে যাবে। কিন্তু দিয়ে গেল না তো। কথাটা ওকে একটু বলো।

জয়নাল ঝটপট বলে, অবশ্যই বলব দাদা। পাঁচ দিন হয়ে গেল, এখনো দিল না কেন? এটা তো ঠিক করেনি।

দুদিন পরের কথা। সকালে দোকান খুলে চেম্বারে বসেছেন ধীরেনকা। এমন সময় মোনাফ মিয়ার হোন্ডা এসে থামে ধীরেনকার দোকানের সামনে। এলাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত মোনাফ মিয়া। মাত্র পঁচিশ/ছাব্বিশ বছর বয়স। কিন্তু করতে পারে না হেন খারাপ কাজ নেই। সম্প্রতি যোগ দিয়েছে জাতীয়তাবাদী দলে। দলের সব কাজে সে সক্রিয়।

হোন্ডা থেকে নেমে চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে ধীরেনকার চেম্বারে ঢোকে মোনাফ মিয়া। সালাম দিয়ে বলে, কেমন আছেন কাকা?

মোনাফ মিয়াকে ভালো করে একবার দেখেন ধীরেনকা। তারপর হালকা চালে বলেন, এই আছি।

– ভালো থাকলেই ভালো। আমরা চাই আপনি ভালো থাকেন। কোট ছাড়া কিন্তু আপনারে ভালোই লাগতেছে কাকা। আমরা চাই আপনি কোট না পরে এভাবেই থাকেন।

ধীরেনকা মোনাফ মিয়ার দিকে তাকিয়ে একটু ভাবেন। ভেতরে কেমন খটকা লাগে তার। এই ছেলে বলে কী! ভাবতে ভাবতে ধীরেনকা বলেন, তার মানে, কী বলতে চাও তুমি?

– ও, এখনো বুঝেন নাই, না? তাহলে শোনেন, আপনার কোটটা এমনিতে নিয়ে যাওয়া হয় নাই। এই কোট যাতে আপনি না পরেন, সেই জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোট আর ফেরত পাবেন না কইলাম। এর-ওর কাছে আর কোট খুঁজবেন না। ঠিক আছে?

ধীরেনকার কাছে এবার পরিষ্কার হলো, নাটকের নামে কোট চেয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একটা ষড়যন্ত্র। এর সঙ্গে নিশ্চয়ই বেলাল-জয়নালসহ গোপনে অনেকেই জড়িত। মনে মনে অবাক হলেন ধীরেনকা, আমার কোট পরা নিয়ে ওদের এত মাথাব্যথা! ভাবতে ভাবতে বলেন, আমার গায়ের মুজিব কোট খুলে নেওয়ার জন্য তোমাদের এমন নাটক সাজাতে হলো মোনাফ! কিন্তু এভাবে একটা কোট কেড়ে নিয়ে গেলেই কি মানুষের মন থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলা যাবে?

মোনাফ মিয়া মুখ বিকৃত করে হুংকার দিয়ে ওঠে এবার, একটা কোট কেন, ওই লোকের স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলার জন্য যা-যা করা দরকার তা-ই করা হবে।

ধীরেনকা এবার আর হাসি চেপে রাখতে পারেন না। স্মিত হেসে ধীর শান্ত কণ্ঠে বলেন, তা তোমরা কোনোদিনও করতে পারবে না মোনাফ, সেটা অসম্ভব। কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু সাধারণ একটা মানুষ ছিলেন না যে, মৃত্যুতেই তিনি বিলীন হয়ে যাবেন, হত্যা করে তাঁকে মুছে ফেলা যাবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটা আদর্শ, একটা চেতনা। মুক্তিযোদ্ধা ধীরেন্দ্র বড়ুয়ারা বেঁচে থাকতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ-চেতনা কোনোদিন মুছে ফেলা যাবে না। আমি নতুন আরেকটি মুজিব কোট বানাবো। দেখি তোমরা কী করতে পারো।

মোনাফ মিয়া ততক্ষণে হোন্ডায় উঠে বসেছে। হোন্ডা স্টার্ট দিতে দিতে কী যেন বলছিল আরও। কিন্তু হোন্ডার শব্দেই চাপা পড়ে গেল তার কথা।

## আমি দেখেছি–

### আ. শ. ম. বাবর আলী

আমি একটা হিমালয় দেখেছি–
দিনের পর দিন যে
উঁচু হতে হতে
আকাশটাকে ছুঁতে চেয়েছিল,
কখনো মাথা নত করেনি–
পৃথিবীর কোনো হিংস্র
দানবের কাছেও;
একদিন আকাশটাকে সে
ছুঁয়েছিল।
আমি একটা সমুদ্রকে দেখেছি–
কোনোদিন যে বিনম্র বশীভূত হয়নি
কারো কাছে;
বরং তাঁর বিক্ষুব্ধ প্রচণ্ড ঊর্মি আঘাতে
বিধ্বস্ত করে দিয়েছে
উপকূল জঞ্জাল,
তারপর পলি জমিয়ে
সৃষ্টি করেছে সেখানে
বসতি ভূ-ভাগ।

আমি একটা বিশাল অরণ্যকে দেখেছি–
পরিপূর্ণ যে অরণ্য
অসংখ্য সুবাসিত নানা রং-ফুলে,
যেখানে নিজেই সে গড়ে দিয়েছে
কাকলিমুখর
অসংখ্য গানের পাখির
নিশ্চিন্ত বসতি।

এমনিভাবে আমি দেখেছি–
একটি হিমালয়
সমুদ্র এরং অরণ্য–
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যাঁর
অন্য নাম।

## জাতির জনক

### সত্যজিৎ বিশ্বাস

বিশ্ব আজ দুইভাগে ভাগ শোষক আর শোষিত,
চিরসত্য বাণীটি মহান জাতির জনক ঘোষিত।
শোষিতের পক্ষে দীপ্তকণ্ঠে তর্জনী উঁচু করে,
আপোশ করে নোয়ায়নি মাথা, আজীবন গেছে লড়ে।

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম– উদাত্ত কণ্ঠস্বর,
লাখো বাঙালির চিত্তে সেদিন তুলে দিয়েছিল ঝড়।
কয়েক মুহূর্তের একটি ভাষণে বাঙালি তোলপাড়
নিরস্ত্র জাতি সশস্ত্র হয়, মানেনি কখনো হার।

স্বাধীন দেশের পতাকা নিয়ে গর্বে যখন দেশ,
জাতির পিতাকে কুচক্রীরা সপরিবার করে শেষ।
পনেরোই আগস্ট বাঙালি জাতির গভীর শোকের দিন,
জাতির জনক সূর্য সন্তানের কাছে গোটা জাতির ঋণ।

## বঙ্গ জাতির নেতা

### জাহানারা জানি

জন্ম খোকার গ্রামের মাঝে
গ্রামই ভালো লাগতো
মনের সুখে পথের ধূলা
সারা গায়ে মাখতো।
বনের পাখি পোষ মানাতো ভালো বেসে বেসে
সবার সাথে বলতো কথা খোকা হেসে হেসে
পরের দুখে কষ্ট পেয়ে খুলে দিতো জামা
তারা গ্রামের দুখি মানুষ নয়তো খালু-মামা
খাবার আগে সঙ্গে খোকা সঙ্গীসাথি আনতো
সবার সাথে খেতো খোকা সবাই সেটা জানতো
শীতের দিনে গায়ের চাদর দুখিকে দেয় খুলে
হাঁটছে খোকা বাড়ির দিকে দুহাত বুকে তুলে
এসব দেখে খোকার বাবা হতো ভীষণ সুখি
বুঝতো বাবা খোকা হবে দুখির দুখে দুখি
ছোট্ট খোকার বুকটা ছিল দয়ায় মায়ায় ভরা
মনটা ছিল সবুজ শ্যামল স্বপ্ন দিয়ে গড়া।
সত্যপথে খোকা ছিল ভীষণ স্বাধীনচেতা
সেই খোকাটি হলো শেষে
বঙ্গ জাতির নেতা।

## এখনো টুঙ্গিপাড়ার মাজার থেকে

### খান চমন-ই-এলাহি

আমাদের টুঙ্গিপাড়া-কোটালিপাড়া বাইগার বিল
এখনো আপনার পদধূলি পায়
এখনো শুনতে পায়, এবারের সংগ্রাম
আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম ...

প্রত্যেক নতুন সূর্যোদয়ে তাই প্রিয় বাঙালির কবর
হয়ে ওঠে রাজনীতির তীর্থ–মাজার শরিফ
শুধু বাঙালির নয়; সাদা-কালো প্রত্যেক নির্যাতিতের
শোষিত-বঞ্চিত প্রত্যেক ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের।

বঙ্গবন্ধু, আপনি নিশ্চিত ঘুমাতে পারেন
কোনো দুর্ভাবনা আর প্রয়োজন নেই–
পিয়াইন থেকে সুন্দরবনের হরিণঘাটার স্রোতে
কিংবা জকিগঞ্জ থেকে কালিগঞ্জ, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া
অবধি
এখনো দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ধ্বনিত হয়
বাংলাদেশের স্থপতি প্রিয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
যতকাল রবে বাঙালি যতকাল রবে বিশ্ব-ইতিহাস
ততকাল আপনি মহান। আপনি অমর-অব্যয়-অক্ষয়।

## বঙ্গবন্ধু এক কিংবদন্তির নাম

### মঈনুল হক চৌধুরী

প্রত্যেক জাতির
একজন মহান নেতা থাকেন–
যিনি জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন
আর সুন্দর আগামীর স্বপ্নে
জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন,
আমাদের সেই মহান পুরুষ
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তিনিই আমাদের জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধুর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব, সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব
ঐন্দ্রজালিক ভাষণ সমগ্র জাতিকে
একসূত্রে গ্রথিত করেছিল
বিকাশ ঘটেছিল বাঙালি জাতিসত্তার।
বঙ্গবন্ধুর আজীবন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগে
আমরা আমাদের প্রিয়
এই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি
খুঁজে পেয়েছি নিজেদের আত্মপরিচয়।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান–
তিনি শুধু বাঙালি জাতির-ই নন,
তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত-শোষিত মানুষের
অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক।
স্বাধীন দেশের মাটিতে
দেশ গড়ার কাজে বঙ্গবন্ধু যখন মগ্ন
তখনই স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি এক হলো–
ষড়যন্ত্রের ফণা তুললো তারা
তাদের ষড়যন্ত্রেই ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট
বঙ্গবন্ধু সপরিবার শহিদ হলেন
মানুষরূপী কিছু হায়েনাদের ছোবলে।
সেদিন থেকেই বাঙালি জাতি লজ্জিত,
হে জাতির পিতা, এ লজ্জা আমরা রাখব কোথায়?
তোমার শোকে বাংলার আকাশ-বাতাস কেঁদেছিল সেদিন
পুরো জাতি ছিল স্তম্ভিত
তাই বছর ঘুরে আগস্ট এলেই
হৃদয়ে নীলকষ্টের ক্ষরণ হয়, চোখ ভাসে জলে।

## এক মহানায়কের অমর কীর্তিগাথা

### শেখ মো. মুজাহিদ নোমানী

১৭ই মার্চ ১৯২০ সাল, হে বঙ্গবন্ধু তুমি জন্মেছিলে
টুঙ্গিপাড়ার এক অজপাড়াগাঁয়ে,
চোখ মেলেই তুমি দেখেছ,
তোমার সোনার বাংলা আছে পরাধীন হয়ে।

ক্লাস ফোরের ছাত্র তখন তুমি,
দেখলে শীতে কাঁপছে এক বৃদ্ধ ফকির খালি গায়ে,
তা দেখে তোমার দয়ার মন উঠল কেঁদে,
আর তাই নিজের গায়ের চাদর দিলে তাকে পরিয়ে।

ক্লাস সেভেনের ছাত্র তুমি, কতটুকুই-বা আর বয়স তোমার,
অথচ পথ আটকে দিলে মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলার,
বজ্রদীপ্ত দাবি ছিল একটাই, ছাত্র হোস্টেলের ছাদ,
মেরামত করে দিতে হবে চমৎকার।

কিশোরেই তোমার সাহস দেখে
মুগ্ধ হলেন নেতা শেরেবাংলা,
সেই সাহসী কিশোর, তুমি আজ মোদের জাতির পিতা,
১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন আর
৭ই মার্চ ১৯৭১-এর অগ্নিঝরা ভাষণে,
উজ্জীবিত মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন হলো সোনার বাংলা।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ ফাঁসির মঞ্চ হতে ফিরে এসে দেখলে
যুদ্ধবিধ্বস্ত, ক্ষতবিক্ষত তোমার সোনার বাংলা,
শুরু হলো ভাবনা, সাড়ে সাত কোটি মানুষেরে দিতে হবে,
অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর বাসস্থানের নিশ্চয়তা।

বুঝেছিলে তুমি তখনই দেশ ও জাতির উন্নয়নে,
উৎপন্ন করতে হবে অনেক ফসল, অনেক খাবার,
আর তাই প্রয়োজন ভালো জাতের ভালো বীজের, সার ও সেচের,
নইলে সোনার বাংলা হয়ে যাবে ছারখার।
তাই প্রকল্প নিলে তুমি কৃষি গবেষণা, বীজ উৎপাদন ও
সম্প্রসারণের।

ভারত, জাপান, রাশিয়াসহ বহু দেশ-মহাদেশ ঘুরে,
বঙ্গবন্ধু সেতুসহ সকল উন্নয়ন চুক্তি করে,
আমৃত্যু দেশে-বিদেশে শান্তি আর ন্যায়ের সুবাতাস ছড়িয়ে,
১৯৭৩ সালে 'জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার' নিয়ে এলে দেশে,
১৯৭৪-এ জাতিসংঘে বাংলায় প্রথম ভাষণ দিয়ে ফিরে এলে শেষে।
হে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু!
তোমার চির-উন্নত শির, উঁচু রেখেছি বার বার।
আজ তাই তোমার জন্মশতবর্ষে
১৬ কোটি মানুষের সোনার বাংলায়,
ভাত-কাপড় আর মাছ-মাংসের নেই হাহাকার।

## অন্তিম শয্যায় শায়িত বঙ্গবন্ধুর পরিবার

### মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ্

আবার ফিরে এল বাংলার ঘরে ঘরে
শোকের ছায়া নিয়ে ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সাল।
পাষাণ বক্ষ নিয়ে এক দল সীমার
রাতের আঁধার চিরে কাকডাকা ভোরে
এক দল সেনা, হাতে মেশিনগান, অজস্র আগ্নেয়াস্ত্র
ট্যাংকের বহর দাঁড়িয়ে ৩২ নং বাড়িকে ঘিরে
উচ্চমাত্রার কোনো শব্দ ছিল না, শুধু পায়ের বুটের আওয়াজ
কিছুটা কলরব শুনে প্রথমত! বঙ্গবন্ধু দু'তলা থেকে
নিচতলায় নামছে সিঁড়ি বেয়ে,
ভাবছে হয়ত বাহিরে
গার্ড বাহিনীর মধ্যে কোনো মতানৈক্য হয়েছে
তাই বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তোলে ডাক পারছে
তোমরা থেমে যাও,
আমি চলে আসছি– ক্ষণিকের মাঝেই
এমনিতর সময়ে হঠাৎ মেশিনগানের প্রচণ্ড শব্দ
তাতে ধসে পড়ছে দালানকোঠা, দরজা-জানালা
ভাঙা দরজা দিয়ে কিছু সেনা ভেতরে প্রবেশ করে
প্রথম দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুকে সিঁড়ির গোড়ায় দেখে রাইফেল হাতে
বুলেট ছুড়ে মারে
বুলেটের আঘাতে তিনি লুটিয়ে পড়লেন সিঁড়ির কোণে
আততায়ীর দল ঘরের ভেতর খুঁজে খুঁজে একে একে সবাইকে
হত্যা করে
অসহায় আত্মাগুলো নির্বিচারে সবাই মৃত্যুবরণ করেন
মহান আল্লাহকে ডেকে ডেকে
হত্যা করছে আর নেচে নেচে উঠছে উল্লসিত মনে খুনির দল।
সে দিন হয়ত ফজরের আজানের ধ্বনি
মিনার থেকে মিনারে ছুটে চলেছে
কিন্তু মোয়াজ্জিনের আজানের সুর
কেঁপে কেঁপে স্তিমিত হয়ে আসে।
সেদিন ধানমন্ডির আকাশ গুমোট বাঁধা অন্ধকারে ভারী হয়ে যায়
মানুষ শিহরিত হয়ে উঠে শব্দের প্রচণ্ড আওয়াজে,
ঘর থেকে বাইরে এসে মানুষ শুধু
মরণাস্ত্রের ফাঁদ দেখতে পেয়ে
এক পা সামনে এলে দু'পা পেছনে নিয়ে চলে
মরণ সাগরে উঠছে ঢেউ লেকের মাছেরা লেজ নাড়ে ডিগবাজি
খায় গলাগলি করে
গাছের ডাল পাতাগুলো ভেঙে পড়েছে পিচঢালা পথে
পুবের হাওয়ায় উড়ে উড়ে এসে শুধু স্থান পরিবর্তন করে।
আজ থেকে ছেচল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে
এই মৃত্যুঞ্জয়ী ঘটনা ১৫ই আগস্ট আসলে
সবার হৃদয়ে প্রতিঘাত করে মহান আল্লাহকে স্মরণ করে দেয়
তার প্রতিদান দাও মানুষের মাঝে যুগে যুগে অবিচল হৃদয় কোণে।

## জাতির জনক

### অমিত কুমার কুণ্ডু

পিরামিড আর কত উঁচু বলো
কত উঁচু আইফেল
তার থেকে উঁচু, এত উঁচু যাঁকে
ভয় করে রাইফেল।

তাঁকে ভয় পেয়ে ইয়াহিয়া খান
বন্দি রেখেছে জেলে
জেলে থাকেননি, তিনি থেকেছেন
অন্তরে হেসেখেলে।

হয়ত রেখেছে যুদ্ধকালীন
চার দেয়ালের মাঝে
তাতে কিছু হয়? তিনি থেকেছেন
হৃদয়ে সকাল-সাঁঝে।

আমাদের বুকে, আমাদের মুখে
আমাদের অন্তরে
মুজিবের সেই দৃপ্তকণ্ঠ
প্রতিক্ষণ মনে পড়ে।

তিনি আমাদের জাতির জনক
তিনি আমাদের পিতা
একটুও যদি বুক থেকে সরে
জ্বলে ওঠে বুকে চিতা।

## পনেরোই আগস্ট

### দেবকী মল্লিক

সেদিনও সমীরণ ...
বিটপী পাতায় মর্মর ধ্বনি সৃষ্টি করেছিল,
বুলবুল মনের আনন্দে গান গেয়েছিল!
গাছে গাছে সহস্র কুসুম ফুটেছিল,
পূর্ব দিগন্তে লাল টুকটুকে সূর্যটা
ধরণিকে আলোকিত করেছিল!
ধুলার ধরণিতে...
গোধূলির লাল আভা পড়েছিল,
ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলেছিল!
অকস্মাৎ...
আঁধারের কালিমা বসুধায় নেমে এল,
তরঙ্গায়িত নদীতে ভাটার রেশ থমকে দাঁড়াল,
ভরা জোয়ার কোথায় যেন হারিয়ে গেল,
চাঁদের আলো এক নিমিষে অন্তর্হিত হলো!
আর...
বজ্রনিনাদ সপ্তর্ষিমণ্ডলে প্রাণ পেল!
তোমার বুকের তাজা রক্তে বাংলাদেশ রঞ্জিত হলো!
সে রক্তের দাগ প্রতিটি সবুজ ঘাসে,
শিশির বিন্দুতে আজও মিশে রইল!

ঐ রক্তের দাগ যে চিরঞ্জীব
তুমি অক্ষয়, অমর ... তাই
বজ্রকণ্ঠ তোমার চির সজীব!

হে পিতঃ, তোমায় সহস্র কুর্নিশ ॥

# পরিকল্পিত পরিবার একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, প্রজনন স্বাস্থ্য প্রত্যেক নরনারীর অধিকার। নিরাপদ মাতৃত্ব ও প্রসূতি সেবা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, নারীদের সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্তসহ নারীর যথাযথ মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা। পরিকল্পিত পরিবার একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। ১১ই জুলাই 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২১' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এসব কথা বলেন তিনি। এ বছর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য– 'অধিকার ও পছন্দই মূল কথা: প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার প্রাধান্য পেলে কাঙ্ক্ষিত জন্মহারে সমাধান মেলে'– যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি মনে করেন।

বাণীতে রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, পরিবারের আকার ছোটো হলে তা পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার পূরণের পাশাপাশি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের আশঙ্কা রয়েছে। তাই এসময় দেশে প্রজনন স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি আরও জোরদার করতে হবে এবং চলমান কর্মসূচিগুলোতে উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের সন্নিবেশ ঘটাতে হবে।

*রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে ২৫শে জুলাই ২০২১ বঙ্গভবনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ সাক্ষাৎ করেন– পিআইডি*

দারিদ্র্যের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক রয়েছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সীমিত রেখে দারিদ্র্য বিমোচনসহ শিক্ষার হার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে আমাদের বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। মহামারির এসময়ে অধিক সন্তানের জন্মরোধ ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে সক্ষম দম্পতিদের নিকট পরিবার পরিকল্পনা সেবা সঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

### কবি সুফিয়া কামাল নারীসমাজের এক উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন বাংলাদেশের নারীসমাজের এক উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি নারীসমাজকে কুসংস্কার আর অবরোধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। দেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলন সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। নারীদের সংগঠিত করে মানবতা, অসাম্প্রদায়িকতা, দেশাত্মবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে তিনি ছিলেন সর্বদা সচেষ্ট। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ একটি মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিল সুফিয়া কামালের জীবনব্যাপী সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য। ২০শে জুন ২০২১ কবি সুফিয়া কামালের ১১০তম জন্মদিন উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এসব কথা বলেন তিনি।

কবি সুফিয়া কামালের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, কবির প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' প্রকাশিত হয় *সওগাত* পত্রিকায় ১৯২৬ সালে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাঁঝের মায়া* ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ এ কাব্য পড়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ কাব্যের ভূমিকা লিখেন কাজী নজরুল ইসলাম। সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা ও নারী কল্যাণমূলক নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। তাই কবির জীবন ও আদর্শ এবং তাঁর কালোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম নতুন প্রজন্মের প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে।

### তামাক ও ধূমপান বর্জন কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা অনুযায়ী কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত ধূমপায়ীদের মৃত্যুঝুঁকি অনেক বেশি। ফলে তামাক ও ধূমপান বর্জন কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ১৭ই জুন 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এসব কথা বলেন তিনি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য–'আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, জীবন বাঁচাতে তামাক ছাড়ি' অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে।

বাণীতে রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, সরকার জনস্বাস্থ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' সংশোধন এবং ২০১৫ সালে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা' প্রণয়ন করেছে। এতে তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরনের প্রচার-প্রচারণা, পাবলিক প্লেস ও গণপরিবহণে ধূমপান এবং ১৮ বছরের নিচের শিশুদের নিকট বা তাদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালার সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাসহ তামাক ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সচেতন নাগরিক সমাজ, তামাকবিরোধী সংগঠন ও গণমাধ্যমগুলোর সমন্বিত প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি তামাক ও ধূমপানমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

**প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে**

*মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৩রা আগস্ট ২০২১ আয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ঢাকায় ৫টি আবাসন প্রকল্প, মাদারীপুরে সমন্বিত অফিস ভবন এবং বস্তিবাসীদের জন্য মিরপুরে ভাড়াভিত্তিতে ৩০০টি ফ্ল্যাট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা– পিআইডি*

## প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

# সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বস্তিবাসীর মধ্যে ফ্ল্যাট হস্তান্তর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিববর্ষ উপলক্ষে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ঢাকায় নির্মিত ফ্ল্যাট এবং বস্তিবাসীর জন্য মিরপুরে নির্মিত স্বল্প ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাট উদ্‌বোধন ও হস্তান্তর করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ৩রা আগস্ট গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করে এই ফ্ল্যাট উদ্‌বোধন ও হস্তান্তর করেন।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আজিমপুর সরকারি কলোনি, মিরপুর ৬ নম্বর সেকশন, মালিবাগ ও মতিঝিলে ২ হাজার ৪৭৪টি ফ্ল্যাট সংবলিত ৫টি আবাসন প্রকল্প এবং বস্তিবাসীর জন্য মিরপুরে নির্মিত ৩০০টি ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাট উদ্‌বোধন ও হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে মাদারীপুরে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের নির্মিত সমন্বিত অফিস ভবনও উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় মুজিববর্ষে দেশের সব গৃহহীনকে অন্তত একটি ঘর প্রদানের তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ, যে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ সুন্দর ও উন্নত জীবন পাবেন। কিন্তু আমি জানি, জাতির পিতা বেঁচে থাকলে দেশ স্বাধীন হওয়ার ১০ বছরের মধ্যেই দেশের মানুষ উন্নত জীবন পেত। প্রত্যেকটি গ্রাম ও ওয়ার্ড-ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত উন্নত হতো। সে কাজটাই আমরা এখন করে যাচ্ছি।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কয়েকজন বস্তিবাসীর মধ্যে ফ্ল্যাটের বরাদ্দপত্র হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী ঢাকা শহরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা মাত্র ৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। যে কারণে ঢাকার আজিমপুর, মতিঝিল, মিরপুর, মালিবাগ এলাকায় ৩২টি ভবনে ২ হাজার ৪৭৪টি ফ্ল্যাট নতুনভাবে সরকারি আবাসনে যোগ হলো। ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা ২৪ শতাংশে উন্নীত হলো।

### ভবিষ্যতে দেশেই টিকা উৎপাদন হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সবার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনে যত টাকা লাগবে, যত ভ্যাকসিনের প্রয়োজন হবে, আমরা কিনব। ভবিষ্যতে আমরা বাংলাদেশে ভ্যাকসিন উৎপাদন করব, যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা না হয়। ২৭শে জুলাই জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন এবং জনপ্রশাসন পদক ২০২০ ও ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী।

### একনেকে আড়াই হাজার কোটি টাকার ১০ প্রকল্প অনুমোদন

রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেকে ২ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকা ব্যয় সংবলিত ১০টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। সেতু ও কালভার্ট নির্মাণে নৌ-চলাচলের জন্য উপযোগী উচ্চতা ঠিক রাখাসহ একনেক বৈঠকে সাতটি অনুশাসন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নতুন অর্থবছরের প্রথম এবং বর্তমান সরকারের চলতি মেয়াদের ৬১তম একনেক সভায় এ অনুশাসন দেন প্রধানমন্ত্রী।

**প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম**

# গণমাধ্যম কাজ করছে স্বাধীনভাবে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, বাংলাদেশে গণমাধ্যম যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করে এবং গত সাড়ে ১২ বছরে গণমাধ্যমের যে বিকাশ হয়েছে, অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য তা উদাহরণস্বরূপ। ৭ই জুলাই রাজধানীর মিন্টো রোডে তার সরকারি বাসভবন থেকে অনলাইনে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে তথ্য অধিদফতর সংকলিত *অনশ্বর বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনকালে একথা বলেন তিনি।

*তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ ৭ই জুলাই ২০২১ মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে তথ্য অধিদফতর সংকলিত অনশ্বর বঙ্গবন্ধু গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার এসময় উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি*

এসময় বিভিন্ন সংস্থা সময়ে সময়ে নানা দেশের গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা বিবৃতি, প্রতিবেদন দেয় যা বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না– সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, বিশ্বে কিছু সংস্থা আছে যারা বিবৃতি বিক্রি করে। আমরা সাম্প্রতিক সময়ে দেখতে পাচ্ছি, কিছু সংস্থা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিবৃতি দিচ্ছে। এগুলো আসল বিবৃতি বা প্রতিবেদন নয়, বিশেষ মহলের প্ররোচনায় বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এগুলো দিচ্ছে। মাঝে মাঝে বিবৃতি বিক্রিও করছে। তিনি বলেন, মানবাধিকার সংস্থার নামে বিবৃতি বিক্রি বা রিপোর্ট প্রকাশ করা মানবাধিকার উন্নয়নে সহায়ক হয় না বরং মানবাধিকার সংরক্ষণের বিরুদ্ধে যায়।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশে গণমাধ্যম যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করে এ ধরনের স্বাধীনতা কোনো উন্নয়নশীল দেশে ভোগ করে না। আর যে সমস্ত দেশ থেকে এ ধরনের বিবৃতি বা রিপোর্ট দেওয়া হয়, সেই সমস্ত দেশে গণমাধ্যমের যে পরিমাণ জবাবদিহি আছে, আমাদের দেশে সেটি নেই। সেখানে যে-কোনো ভুল সংবাদ পরিবেশন করলে মোটা অঙ্কের জরিমানা গুনতে হয়। ভুল বা অসত্য সংবাদ পরিবেশনের জন্য অনেক সময় পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

*অনশ্বর বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তথ্য অধিদফতরকে ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ওপর যত লেখনী, কবিতা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হবে, আমাদের ইতিহাস সমৃদ্ধ হবে, আমাদের নূতন প্রজন্ম সমৃদ্ধ হবে, তারা বঙ্গবন্ধুকে জানবে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস জানবে। এই যুগে মানুষ যখন প্রচণ্ড আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের পূর্বসূরিরা জাতির পিতার ডাকে কীভাবে জীবন সঁপে দিয়ে দেশ রচনা করেছেন, তা ফিরে দেখা একান্ত প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু কীভাবে একটি নিরস্ত্র জাতিকে উজ্জীবিত করে দেশের জন্য প্রাণ সঁপে দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, সেই ইতিহাস এ ধরনের গ্রন্থগুলো থেকেই সবাই জানবে।

ভার্চুয়াল এ অনুষ্ঠানে তথ্য অধিদফতরের প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার সভাপতিত্ব করেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান, সচিব মো. মকবুল হোসেন এবং পিআইডি'র জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

## শেখ কামালের ৭২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

রাজধানীতে ৫ই আগস্ট সরকারি বাসভবনে বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ কামালের ৭২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তব্য দান শেষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ সমসাময়িক বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন।

এদিন শহিদ শেখ কামালের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর সাথে শহিদ হওয়া পরিবারের সদস্য শেখ কামাল ছিলেন একাধারে ক্রীড়াবিদ ও অন্যদিকে সংস্কৃতিকর্মী। তিনি ফুটবল খেলতেন, ক্রিকেট খেলতেন। আবাহনী ক্রীড়াচক্র সংগঠিত করে বাংলাদেশে আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি অভিনয় করতেন, সেতার বাজাতেন, গান গাইতেন। এমন বহুগুণে গুণান্বিত ছিলেন শহিদ শেখ কামাল। ৫ই আগস্ট তাঁর জন্মদিনে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, শেখ কামালকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে ক্রীড়াঙ্গন-সাংস্কৃতিক অঙ্গনসহ দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। অহমিকাহীন এ মানুষটিকে দেখে কেউ বলতে পারত না তিনি জাতির পিতার পুত্র কিংবা দেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতির পুত্র। নির্লোভ, নিরহংকার এমন মানুষকে হত্যাকারী খুনিচক্রের প্রতি আমি ধিক্কার জানাই।

উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ শেখ কামালের ৭২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৫ই আগস্ট ই-পোস্টার জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি। তিনি ১৯৪৯ সালের ৫ই আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের প্রথম শহিদ হন শেখ কামাল।

শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারি ও দলীয় উদ্যোগে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়। এর মধ্যে ৫ই আগস্ট ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ থেকে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট, উদ্‌বোধনী খাম ও বিশেষ সিলমোহর অবমুক্ত করা হয়। এদিনে আয়োজন করা হয় 'শহিদ শেখ কামাল-এর ৭২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন' ও 'শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার ২০২১' প্রদান অনুষ্ঠান। এসময় ভার্চুয়ালি অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়াও দলীয়ভাবে ধানমন্ডি আবাহনী ক্লাব প্রাঙ্গণে শহিদ শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও পরবর্তীতে বনানী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত শহিদ শেখ কামালের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

**প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা**

## আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

# বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানি সহযোগিতা জোরদারে কাজ করছে

প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বেসরকারি খাতকে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্কের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি ২৯শে জুলাই ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্র–বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল আয়োজিত 'এনার্জি গোলটেবিল' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

উপদেষ্টা তার বক্তব্যে বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে মার্কিন সংস্থাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকার করেন এবং এক্ষেত্রে তাদের আরও বেশি অবদান রাখার আহ্বান জানান। তিনি দেশে তেল এবং গ্যাস অনুসন্ধানে বিশেষত অফশোর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে তাদের উৎসাহিত করেন। নিরবচ্ছিন্ন এবং সাশ্রয়ী মূল্যের নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের গবেষণা ও উন্নয়নে মার্কিন বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদার হওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তিনি মার্কিন সংস্থাগুলোকে বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ মডুলার রিঅ্যাক্টরের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করার আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ তার প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল এবং ভুটানের সাথে আঞ্চলিক বিদ্যুৎ বিতরণে নিবিড়ভাবে কাজ করছে এবং মার্কিন সংস্থাগুলো সেখানে বিনিয়োগের সুযোগগুলো অনুসন্ধান করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র–বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট নিশা বিসওয়াল গোলটেবিলে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা পূরণে দুদেশের জ্বালানি অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিতে তার সংস্থার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশের সাথে জ্বালানি সহযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য বিজনেস কাউন্সিলের আসন্ন 'এনার্জি টাস্কফোর্স' একটি জ্ঞান-ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হবে বলে উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। এই গোলটেবিল আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম সহিদুল ইসলাম, শেভরন, চেনিয়ার, এক্সিলারেট এনার্জি, এক্সনমোবিল, জিই পাওয়ার, সানএডিসনসহ বেশ কয়েকটি মার্কিন সংস্থার সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট লেভেলের কর্মকর্তাগণ এবং যুক্তরাষ্ট্র চেম্বার, যুক্তরাষ্ট্র–বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে, জ্বালানি উপদেষ্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের জ্বালানি সম্পদ ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত সহকারী সচিব, রাষ্ট্রদূত ভার্জিনিয়া ই পামারের সাথে বাংলাদেশ–মার্কিন জ্বালানি সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে রাষ্ট্রদূত পামার দুদেশের জ্বালানি সহযোগিতা গভীরতর করার লক্ষ্যে বিশেষত নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশের সাথে কাজ করার বিষয়ে তার সরকারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনের জ্বালানি নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনকে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত পামার বাংলাদেশে দশটি কয়লা চালিত পাওয়ার প্ল্যান্ট বাতিল করার সাম্প্রতিক পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

**প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন**

## উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

# সরকারের কোষাগারে উদ্বৃত্ত ২৭০৩ কোটি টাকা

আগের বছরটি যেখানে বড়ো অঙ্কের ঘাটতি দিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকারের কোষাগারে নগদ উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ৭০৩.০৯ কোটি টাকা। করোনা মহামারির মধ্যেও সরকারের ব্যালেন্স শিটে এই উদ্বৃত্ত পাওয়া গেল। ৬ই জুলাই বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, উদ্বৃত্ত এই তহবিল এসেছে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে।

সরকারের আর্থিক বিভাগের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, সরকারের দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনার ফল এই উদ্বৃত্ত। তিনি বলেন, সরকার ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফপি) ব্যবস্থা চালু

করেছে। এর পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক, এডিবি এবং এআইআইবি'র বড়ো আকারের বাজেটীয় সহায়তাও এমন দক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সহায়ক হয়েছে।

কর্মকর্তারা আরও বলেন, ইন্টেগ্রেটেড বাজেট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমের আওতায় ১৬টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অলস অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়াও এই উদ্বৃত্ত তৈরিতে বড়ো ভূমিকা রেখেছে।

**মোংলা বন্দরে যুক্ত হচ্ছে তিনটি ক্রেন**

অত্যাধুনিক মোবাইল হারবার ক্রেন নিয়ে মোংলা বন্দরে ভিড়েছে বিদেশি জাহাজ 'ইমকি'। ইতালি পতাকাবাহী এ জাহাজটি ৭ই জুলাই বন্দরের ৯ নম্বর জেটিতে ভিড়ে। জাহাজটিতে মোংলা বন্দরের জন্য তিনটি অত্যাধুনিক মোবাইল হারবার ক্রেন ছাড়াও ৮০টি প্যাকেটে করে এর মূল্যবান যন্ত্রাংশ আনা হয়েছে।

জাহাজটির স্থানীয় শিপিং এজেন্ট অলসিস শিপিং লিমিটেডের প্রতিনিধি সাখাওয়াত হোসেন মিলন জানান, গত এক মাস আগে জার্মানের রকস্ট্রক বন্দর থেকে মোবাইল হারবার ক্রেন নিয়ে মোংলা বন্দরের উদ্দেশে ছেড়ে আসে 'ইমকি' জাহাজটি। অত্যাধুনিক এই ক্রেন তৈরি করেছে জার্মানির লিভার কোম্পানি। এটি মোংলা বন্দরে সরবরাহ করছে সাইফ পাওয়ার লিমিটেড।

বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিক করতে নতুন নতুন ইকুইপমেন্ট সংযোজন করা হচ্ছে জানিয়ে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা বলেন, নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বিদেশিরা এই বন্দর ব্যবহারে আগ্রহ বাড়াচ্ছে। এরই মধ্যে এই বন্দর একটি লাভজনক বন্দরে পরিণত হয়েছে। বন্দর ব্যবহারে সকল প্রকার জটিলতা কাটিয়ে এ বন্দর এখন পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

**প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ**

## ডিজিটাল বাংলাদেশ

# ই-পাসপোর্টের জন্য ই-গেট চালু

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ই-পাসপোর্টের জন্য চালু করা হলো ই-গেট। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশই প্রথম ই-পাসপোর্টের জন্য ই-গেট চালু করতে সক্ষম হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২০ সালের ২২শে জানুয়ারি ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্‌বোধন করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ৩০শে জুন ই-গেটের উদ্‌বোধন করেন।

২০১৮ সালের ১৯শে জুলাই ইমিগ্রেশন এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং জার্মানি ভেরিডোস জিএমবিএইচ সংস্থা ইলেকট্রনিক পাসপোর্টের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই সংস্থাটির মাধ্যমেই ই-পাসপোর্ট ও ই-গেট স্থাপন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিক অবস্থায় ই-পাসপোর্টধারীদের শনাক্ত করবে ই-গেট। ই-পাসপোর্টে মাইক্রোপ্রসেসর চিপ এবং অ্যান্টেনা বসানো রয়েছে। একজন ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য পাসপোর্টের মুদ্রিত এ চিপে সংরক্ষিত থাকে। ই-গেটে পাসপোর্ট স্ক্যান করার পর গেটের সঙ্গে সংযুক্ত ক্যামেরা যাত্রীকে শনাক্ত করবে। যা এতদিন ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করত ইমিগ্রেশন পুলিশ।

**ডিজিটাল কর্মসূচি ব্যাংকিং খাতে পরিবর্তন**

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ফলে দেশের ব্যাংকিং লেনদেনে বিস্ময়কর পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ডিজিটাল ব্যাংকিং তৃণমূল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ক্রমেই ক্যাশলেস সোসাইটির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই ব্যাপারে গ্রাহকদের মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী। ২৭শে জুন অগ্রণী ব্যাংকের অগ্রণী ই-অ্যাকাউন্ট মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য উদ্ভাবিত অ্যাপ-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, আমরা তৃতীয় শিল্পবিপ্লব বা ইন্টারনেটভিত্তিক শিল্পবিপ্লবের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে। সামনের পথ অনেক বড়ো। প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন আনবে ব্যাংকিং

*ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ১লা আগস্ট ২০২১ 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ-এর সুবর্ণ জয়ন্তী' উপলক্ষে ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট, উদ্‌বোধনী খাম ও ৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটাকার্ড অবমুক্ত করেন– পিআইডি*

খাতে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বে গত ১২ বছরে বাংলাদেশে ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। আজকের বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে অংশ গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈরি। করোনাকালেও ব্যাবসা-শিল্প-অফিস, সভা, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা অনলাইনে চলছে। প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েরাও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরের রান্না খাবারও গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

**বাংলাদেশের স্মার্ট সিটির উন্নয়নে কাজ করতে চায় জাপান**

স্মার্ট সিটির উন্নয়নে জাপান বাংলাদেশের সাথে একত্রে কাজ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নওকি। ৪ঠা জুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সাথে আইসিটি বিভাগের সভাকক্ষে দ্বিপক্ষীয় বৈঠককালে এসব কথা বলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেন, জাপান বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নসহ অনেক ক্ষেত্রে অবদান রাখছে এবং জাপান বাংলাদেশের স্মার্ট সিটির বিকাশেও আগ্রহী। জাপান ও বাংলাদেশ কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিকাশের মাধ্যমে দুদেশের মধ্যকার সহযোগিতা আরও বিস্তৃত হয় সে বিষয়ে একত্রে কাজ করার উপরও গুরুত্বারোপ করেন রাষ্ট্রদূত। তিনি আরও বলেন, আইসিটি এখন অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এজেন্সি (জাইকা) প্রযুক্তিনির্ভর মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশের ২০৪১ সালের জন্য মাস্টার প্ল্যান উন্নত, সমৃদ্ধ করতে পারে।

**প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি**

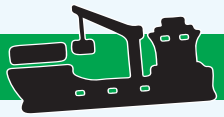

## শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

# জুতা রপ্তানিতে বাংলাদেশের সুদিন

প্রধানত দুই ধরনের জুতা তৈরি হয় দেশে– চামড়া ও চামড়াবিহীন। কিছু স্থানীয় চাহিদা মেটায়, কিছু হয় রপ্তানি। কোভিডের কবলে পড়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রপ্তানি ধাক্কা খেলেও এক বছর পর তা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। পুরো কোভিড চলাকালীন বিদায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জুতা রপ্তানি হয়েছে ৯২ কোটি মার্কিন ডলার।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর পাঁচ অর্থবছরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছিল ৭৮ কোটি ডলারের চামড়াজাত ও চামড়াবিহীন জুতা। পরের বার ৮১ কোটি এবং তারপরের বার ৮৮ কোটি ডলারের রপ্তানি হলেও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এক ধাক্কায় তা নেমে আসে ৭৬ কোটি ডলারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর যা রপ্তানি হয় তার মধ্যে চামড়ার তৈরি জুতাই ৮৫ শতাংশের মতো। বাকিটা সিনথেটিকসহ অন্যান্য পণ্যের।

লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এলএফএমইএবি)-এর সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বে জুতার মোট বাজারের ৫৫ শতাংশ চীনের দখলে। বিশ্বে জুতার বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮তম।

ইপিবি'র তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে কানাডা, সুইজারল্যান্ড, আলজেরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, মালদ্বীপ, মেক্সিকো, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ডস, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুরসহ ৯০টির মতো দেশে জুতা রপ্তানি হচ্ছে।

**বাংলাদেশ বাইসাইকেল রপ্তানিতে ইউরোপে তৃতীয়**

ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ২৭টি দেশে বাইসাইকেল রপ্তানিতে বাংলাদেশ এক ধাপ এগিয়ে এখন তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে। বর্তমানে গোটা বিশ্বে বাইসাইকেল রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম।

রপ্তানির উদ্দেশ্যে দুই যুগ আগে ১৯৯৬ সালে ঢাকার তেজগাঁওয়ে সরকারি বাইসাইকেল তৈরির প্রতিষ্ঠান কিনে নেয় মেঘনা গ্রুপ। বর্তমানে ট্রান্স ওয়ার্ল্ড বাইসাইকেল, ইউনিগ্লোরি ও মাহিন সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ নামে তিনটি ইউনিটে সাইকেল উৎপাদন করছে তারা। এরপর ১৯৯৮ সালে কারখানা করে মালয়েশিয়াভিত্তিক আলিটা বিডি। চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) স্থাপিত হয় শতভাগ রপ্তানিমুখী এই কারখানা। এরপর তাইওয়ানভিত্তিক 'করভো' একই ইপিজেডে স্থানীয় বাজার ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে করে আরেকটি কারখানা।

২০০৩ সালে রপ্তানি শুরু করে মেঘনা গ্রুপ। বাইসাইকেল তো বটেই, তাদের কারখানায় উৎপাদিত টায়ার ও টিউব বিশ্বের ১৮টি দেশে সরাসরি রপ্তানি হচ্ছে। আর ২০১৪ সালে দুরন্ত ব্র্যান্ড নিয়ে আসে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। ৫ হাজার টাকা থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত দামের বাইসাইকেলও রয়েছে বাংলাদেশি কোম্পানিগুলোর। ইইউভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাইসাইকেল রপ্তানি হয় জার্মানিতে, এরপর ডেনমার্ক ও যুক্তরাজ্যে। এছাড়া নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, ইতালি, বুলগেরিয়া ইত্যাদি দেশে বেশি বাইসাইকেল রপ্তানি করা হচ্ছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর তথ্য অনুযায়ী, ৩০শে জুন সমাপ্ত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৩ কোটি ৮ লাখ ডলারের বাইসাইকেল রপ্তানি হয়েছে। আগের অর্থবছর রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ২৮ লাখ ডলার। সেই হিসাবে এক বছরে বাইসাইকেল রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ৫৮ শতাংশের বেশি।

**প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন**

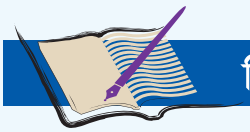

## শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

# শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চার নির্দেশনা

ডেঙ্গু রোগের বিস্তার রোধে চার দফা নির্দেশনা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এ নির্দেশনা ৩রা আগস্ট মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সব দফতর, সংস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষা

মন্ত্রণালয়ের এসব নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে–শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ ও আশপাশের খোলা জায়গা নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের ভবন, খোলা জায়গা, মাঠ, ফুলের টব, পানির পাম্প বা পানি জমে এমন পাত্র, ফ্রিজ বা এসির পানি জমার ট্রে, পানির ট্যাপের আশপাশের জায়গা, বাথরুম ও এর কমোড, গ্যারেজ, নির্মাণাধীন ভবন, লিফট্ বা সিঁড়ি, পরিত্যক্ত বস্তু ইত্যাদি এডিস মশার সম্ভাব্য প্রজননস্থলে যেন দুই দিনের বেশি পানি জমতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকরা অনলাইন ক্লাসে শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কোভিড-১৯ ও ডেঙ্গু বিস্তার রোধে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের অনুরোধ করবেন। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী ডেঙ্গু বিস্তার রোধে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

### শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের টিকা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চার নির্দেশনা

শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনার টিকা দেওয়া নিয়ে চার দফা নির্দেশনা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মো. নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এই নির্দেশনা ইউজিসি চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার চেয়ারম্যান বরাবর পাঠানো হয়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে– সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ১৮ বছরের বেশি বয়সি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজ নিজ ভ্যাকসিন গ্রহণের বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্বুদ্ধ করবেন।

**প্রতিবেদন : মো. সেলিম**

## বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

# বাংলাদেশে বিনিয়োগের বড়ো সুযোগ

নতুনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। গত ১২ বছরে বাংলাদেশের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। সত্যিকারের পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশে স্থানীয় বাজারে বিনিয়োগেরও বড়ো ধরনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের শেয়ারবাজারের ব্যাপ্তি এবং বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রে সপ্তাহব্যাপী 'রোড শো' শুরু হয়েছে । ২৬শে জুলাই নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের ইন্টারকন্টিনেন্টাল বার্কলের বলরুমে এ 'রোড শো'র উদ্‌বোধনী পর্বে বক্তারা এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন, আমাদের ইউনিয়ন পর্যায়ে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, বিউটি পার্লার, জিম, পোষা প্রাণীর বাজার গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, স্থানীয় পর্যায়ে ট্যুরিজম মার্কেটও গড়ে উঠেছে। এভাবেই বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে। এদেশের স্থানীয় বাজারে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। প্রবাসীরা দারুণভাবে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠানে ট্রেড পলিটিক্স রয়েছে, যা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের পথকে সুদৃঢ় করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনীতিতে একটা স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। বিদেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, আমাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অনেক ভালো। সরকারের ভিশন-২০৪১ আছে। এ সময়ের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ব বলে লক্ষ্য আছে। সরকারের ডেল্টা প্ল্যানও আছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে সরকারি, বেসরকারি ইকোনমিক জোন রয়েছে। এর মধ্যে মিরসরাইয়ে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরী অন্যতম। ইকোনমিক জোনগুলোতে এক সঙ্গে অনেক সুবিধা আছে। সব ধরনের সুবিধা এক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। তাতে ব্যাবসা আরও সহজ হয়ে গেছে। কোনো কাজের জন্য ভোগান্তি নেই। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগের স্থানীয় নানা ধরনের বাজারে সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিএসইসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইট ও জ্যামাইকায় ব্রোকারেজ হাউজের শাখা হিসেবে শিগগিরই ডিজিটাল আউটলেট বা বুথ চালু করা হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর সব দেশেরই ডিজিটাল আউটলেট বা বুথ স্থাপনের মাধ্যমে রিয়েল টাইমে ট্রেড করার সব ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, ইতোমধ্যে আমাদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রে ডিজিটাল আউটলেট স্থাপনের জন্য ৪টি কোম্পানি আবেদন জানিয়েছে। আমরা বিশ্বের যে-কোনো দেশে ডিজিটাল আউটলেট খোলার জন্য ধারাবাহিকভাবে অনুমতি দিয়ে দিচ্ছি।

মিউচ্যুয়াল ফান্ড পরিচালনাকারীদের সংগঠন এএএমসিএমএফ'র সভাপতি ড. হাসান ইমাম বলেন, আমেরিকার বেশ কিছু বিনিয়োগকারী বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমে বাংলাদেশে সাসটেইনেবল বিনিয়োগের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সুযোগসুবিধার কারণে তারা এ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বেসরকারি এনটিটিসহ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের সকল আদর্শ ব্যবস্থা এখন বাংলাদেশে বিরাজমান। এজন্য আমেরিকান বাংলাদেশিরা (এনআরবি) দেশের পুঁজিবাজারে আস্থা পাচ্ছেন।

### ফিনটেক, লজিস্টিক এবং ডিজিটাল ই-কমার্সসহ স্টার্টআপ সেক্টরে ৩০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, স্থানীয় স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম উন্নয়ন প্রচেষ্টাই হচ্ছে নতুন উদ্ভাবনের মূল ভিত্তি। সরকার স্টার্টআপ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এবং এর উন্নয়ন ও বিকাশে আইডিয়া প্রকল্প এবং স্টার্টআপ বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠাসহ নতুন নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে তরুণ

উদ্ভাবকদের মেন্টরিং, কোচিং, হাইটেক পার্কসমূহে সিডমানি প্রদানসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করছে। প্রতিমন্ত্রী ২৬শে জুলাই 'Startup Landscape in Bangladesh & India: Tech Startups Transforming the Future' শীর্ষক ওয়েবিনারের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, গত ৪ বছরে ফিনটেক, লজিস্টিক এবং ডিজিটাল ই-কমার্সসহ স্টার্টআপ সেক্টরে ৩০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়েছে।

**প্রতিবেদন : এইচ কে রায় অপু**

*বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২১' বিজয়ীদের সাথে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। ৮ই আগস্ট ২০২১ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন– পিআইডি*

## নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

# পুরুষের তুলনায় নারীর গড় আয়ু ৩ বছর বেশি

পুরুষের তুলনায় নারী গড়ে তিন বছর তিন মাস বেশি বাঁচেন। এ হার দিন দিন বাড়ছে। পুরুষের প্রত্যাশিত আয়ু যেখানে ৭১.২ বছর, নারীর গড় আয়ু সেখানে ৭৪.৫ বছর। বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষের গড় বয়স কমছে। নারীর ক্ষেত্রে বয়স বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে। মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস অব বাংলাদেশ (এমএসভিএসবি) প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত এ জরিপ প্রতিবেদনটি ২৮শে জুন রাজধানীর পরিসংখ্যান ভবন মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

জরিপ তথ্য বলছে, ২০১৯ সালে পুরুষ গড়ে ২৫.৩ বছর বয়সে বিয়ে করতেন। আর নারী করতেন ১৮.৯ বছর বয়সে। ২০২০ সালে পুরুষের বিয়ের বয়স কমে হয়েছে ২৪.২ বছর। আর নারীর বেড়ে হয়েছে ১৯.১ বছর।

### বাংলাদেশের শমী ডায়ানা লিগেসি অ্যাওয়ার্ডের বিচারক

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ২০২১ সালের ডায়ানা লিগেসি অ্যাওয়ার্ডের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন শমী হাসান চৌধুরী। প্রিন্সেস ডায়ানার ভাই লর্ড স্পেন্সারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক নমিনেশন থেকে প্রথম ২০ জনকে বাছাই করতে কাজ করবেন তিনি। ২৫শে জুন দৈনিক *ইত্তেফাকে* প্রকাশিত খবরে এ তথ্য জানা যায়।

আগামী ৯ই ডিসেম্বর 'আলথর্প হাউস' অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন লর্ড স্পেন্সার। যেখানে সারা বিশ্ব থেকে মানবিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০ জন তরুণকে দেওয়া হবে ডায়ানা লিগেসি অ্যাওয়ার্ড ২০২১। মর্যাদাপূর্ণ এ অ্যাওয়ার্ডের প্রবর্তন করা হয় ২০১৭ সালে।

২৬ বছর বয়সি শমী হাসান ২০১৯ সালে প্রথম ও একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে এই ডায়ানা লিগেসি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা তৈরির একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করছেন শমী হাসান চৌধুরী। অ্যাওয়ারনেস ৩৬০ নামক একটি সেবামূলক সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা তিনি।

### আন্তর্জাতিক সম্মাননা পেলেন শিক্ষক জিনাত রেজা

সম্মানজনক এক্সেলেন্সপ্লারি রিসার্চ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষক জিনাত রেজা খান। ২৩শে জুন *প্রথম আলো* পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে এ খবর জানা যায়। একাডেমিক নৈতিকতার প্রসারে অনন্য অবদান রাখা শিক্ষক কিংবা গবেষকদের প্রতিবছর এই সম্মাননা প্রদান করে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক সংগঠন ইউরোপিয়ান নেটওয়ার্ক ফর একাডেমিক ইন্টেগ্রিটি।

জিনাত খান দুবাইয়ের ইউনিভার্সিটি অব ওলংগংয়ের সহকারী অধ্যাপক। সেখানে তিনি সাইবার নৈতিকতা ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে পড়ান। দুই যুগের বেশি সময় ধরে একাডেমিক নৈতিকতা বিষয়ক গবেষণা ও এর প্রসারের সঙ্গে জড়িত তিনি। ২০১৪ সালে এ বিষয়ের ওপর তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিসহ বিশ্বের বিভিন্ন নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক নৈতিকতা বিষয়ে সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালা পরিচালনা করেছেন জিনাত রেজা খান।

**প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী**

## ১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

# সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত

করোনাভাইরাস মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২৪শে জুলাই ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া অন্যান্য জেলায় যেমন: নরসিংদী জেলায় ত্রাণ হিসেবে ৮৯ হাজার মেট্রিক টন চাল, ভিজিএফ কার্ডের ১৩৭৬ দশমিক ৫৯০ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ২৩ পরিবার

ও ৪৬১৫ জনকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। শরীয়তপুর জেলায় ত্রাণ হিসেবে নগদ ১ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়। মুন্সিগঞ্জ জেলায় ত্রাণ হিসেবে ৫ লাখ টাকা নগদ, ১০ মেট্রিক টন চাল, ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৬২৩ দশমিক ১৫০ মেট্রিক টন চাল এবং ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৩৭টি পরিবার ও ৪৬১৫ জনকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। ফরিদপুর জেলায় ত্রাণ হিসেবে ২০ দশমিক ৮০ মে.টন চাল, শুকনো খাবার ১ হাজার প্যাকেট এবং ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৪৬৫টি পরিবার ও ১৮৬০ জনকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। কিশোরগঞ্জ জেলায় ত্রাণ হিসেবে নগদ ১ লাখ টাকা, ১০ হাজার মেট্রিক টন চাল, ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১১০০ দশমিক ৩১০ মেট্রিক টন চাল এবং ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৪৮২ পরিবার ও ২৪১০ জনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

**নেত্রকোণায় জটিল রোগে আক্রান্তদের মাঝে আর্থিক অনুদান**

নেত্রকোণায় বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্তদের মাঝে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু। ২৮শে জুলাই নেত্রকোণা শহরের মোক্তারপাড়া এলাকার নিজ বাসায় ১২ জনের মাঝে ৫০ হাজার টাকা করে মোট ৬ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। ক্যানসার, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগসহ অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্তদের মাঝে এই চেক বিতরণ করা হয়। এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থাকতে দেশের একজন মানুষও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করবে না। তিনি সারা দেশে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তাসহ যা যা করণীয় তাই করছেন।

**টিসিবি'র পণ্য মাসব্যাপী বিক্রয় শুরু**

২৬শে জুলাই থেকে ২৬শে আগস্ট পর্যন্ত (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) মাসব্যাপী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী বিক্রয় শুরু করেছে।

*৩রা জুলাই ২০২১ রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ওএমএস'র মাধ্যমে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে চাল বিক্রয়– পিআইডি*

টিসিবি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর শোকাবহ আগস্ট মাসে কঠোর লকডাউন পরিস্থিতিতে ভোক্তা সাধারণের নিকট ভরতুকি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী নিয়োজিত ডিলারের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে দেশব্যাপী বিক্রয় করছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে– সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ১০০ টাকা, মশুর ডাল প্রতি কেজি ৫৫ টাকা এবং চিনি প্রতি কেজি ৫৫ টাকা।

**প্রতিবেদন : মেজবাউল হক**

## কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

# চালের উৎপাদন বেড়েছে চার গুণ

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতায় সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দেশে কৃষি খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে গত ৫০ বছরে চালের উৎপাদন বেড়েছে চার গুণ। ১৯৭১-১৯৭২ সালে যেখানে চাল উৎপাদন ছিল মাত্র এক কোটি মেট্রিক টন, সেখানে ২০২০ সালে তা বেড়ে প্রায় চার কোটি মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। একসময়ের খাদ্য ঘাটতির দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ১৪ই জুলাই কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে ভার্চুয়ালি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) আয়োজিত 'কোভিড পরিস্থিতিতে জলবায়ু সহনশীল কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তর' শীর্ষক আলোচনাসভায় এ কথা বলেন তিনি।

শুধু চালের মোট উৎপাদন নয়, চালের উৎপাদনশীলতায়ও দেশ অনেক এগিয়ে গেছে উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ১৯৯১ সালে হেক্টরপ্রতি চালের গড় উৎপাদন ছিল ১ দশমিক ৭১ টন। আর ২০২০ সালে হেক্টরপ্রতি চাল উৎপাদন হয়েছে গড়ে চার টনেরও বেশি। কৃষি গবেষণার মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, কৃষি উপকরণে ভরতুকি প্রদান ও সহজলভ্যকরণ, সারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলেই এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

**গবেষণা ও উদ্ভাবনে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান**

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তরের জন্য গবেষণা, উদ্ভাবন ও জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি ২৭শে জুলাই সচিবালয়ে অফিস কক্ষ থেকে ভার্চুয়ালি ইতালির রোমে তিন দিনব্যাপী চলমান জাতিসংঘের ফুড সিস্টেম প্রি-সামিটের 'খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তরে বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো' শীর্ষক সেশনে বক্তব্য প্রদানকালে এ আহ্বান জানান। আন্তর্জাতিক কৃষি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলিত সংগঠন সিজিআইএআর ও আন্তর্জাতিক কৃষক সংগঠন যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে গবেষণা ও উদ্ভাবনে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দসহ সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ ধান, গম, ভুট্টা, ফল ও শাকসবজির অনেকগুলো উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

ধানের জাত উদ্ভাবনের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-ব্রি ১০০টিরও বেশি ধানের উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে, যার মধ্যে ২৬টি জাত বন্যা, খরা, লবণাক্ততাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসহিষ্ণু। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-বিনা ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা

ইনস্টিটিউট-বারিও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসহিষ্ণু ধান ও অন্যান্য ফসলের বেশ কিছু জাত উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া দেশের বিজ্ঞানীরা বিশ্বে প্রথম জিংকসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে।

**প্রতিবেদন : এনায়েত হোসেন**

## পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

# নাগরিক সেবা প্রদানে নয়টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ

নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজ এবং এর গুণগতমান বৃদ্ধির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়বদ্ধতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নয়টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজীকরণের প্রস্তাব বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। ৭ই জুন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত 'বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে উদ্ভাবন প্রদর্শনী' শীর্ষক সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

*পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন ৩১শে জুলাই ২০২১ ইস্ট লন্ডনের সিডনি স্ট্রিটে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন– পিআইডি*

সভায় জানানো হয়, পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র স্বল্পসময়ে প্রদানের লক্ষ্যে 'অনলাইন পেমেন্ট ইন ইসিসি' অটোমেশন সফটওয়্যারে ইলেকট্রনিক ট্রেজারি চালান ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ফি পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। সেবা গ্রহীতাগণ সোনালী ব্যাংক বা বিভিন্ন ধরনের কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সহজেই ফি পরিশোধ করতে পারবেন। বন বিভাগের বাস্তবায়নাধীন 'সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের লভ্যাংশ বিতরণে ডিজিটাল ডাটাবেইজ তৈরিকরণ' প্রক্রিয়ায় স্বল্প সময়ে জনগণকে লভ্যাংশ প্রাপ্তির সংবাদ মোবাইল অ্যাপস-এর মাধ্যমে জানানো যাবে এবং প্রদেয় টাকা অনলাইনে উপকারভোগীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে।

নতুন উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর 'মোবাইল অ্যাপস ও বনজ বৃক্ষের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন' কার্যক্রমের মাধ্যমে বনজ নার্সারি, বাগান বা বন রোগবালাই বা পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হলে উদ্ভাবিত অ্যাপস ব্যবহার করে সেবা গ্রহীতাগণ তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিকার বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন 'রাবার বিক্রয়করণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ'- এর মাধ্যমে ক্রেতাদের চাহিদা প্রাপ্তির সাথে সাথে গুণগত মানসম্পন্ন রাবার সঠিক সময়ে বিক্রয়ের মাধ্যমে রাবার সেক্টরের লোকসান কমে আসবে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড 'প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে ডিজিটাল ডাটাবেইজ তৈরি'র মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে মনিটরিং করা যাবে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম মোবাইল অ্যাপস-এর মাধ্যমে 'উদ্ভিদ নমুনা শনাক্তকরণ' প্রক্রিয়ায় মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে আবেদনকারী কাঙ্ক্ষিত তথ্য জানতে পারবেন। এক্ষেত্রে সিস্টেম ড্যাস বোর্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা, সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারীর তথ্যাদি মনিটরিং-এর ব্যবস্থা থাকবে।

**প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ**

## বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

# দেশের চার কোটি গ্রাহক বিদ্যুতের সুবিধা পাচ্ছে

সরকার দেশের ৯৯ ভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে চলতি বছরেই বাকি সবার ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে। আর এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেশে বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা এখন প্রায় চার কোটি। বিদ্যুৎ বিভাগসূত্রে এ তথ্যই জানা যায়।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, ২০০৯ সালে বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা ছিল এক কোটি ৮ লাখ। এক যুগ পরে ২০২১ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় চার কোটিতে। আর বিদ্যুতের সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৪৭ থেকে পৌঁছেছে ৯৯ ভাগে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট থেকে দাঁড়িয়েছে ৫১২ কিলোওয়াটে। তবে এলক্ষ্য পূরণে শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সহজ হলেও গ্রাম ও দুর্গম এলাকায় ছিল চ্যালেঞ্জের। এ সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ২৯ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৪৯টি। অবসরে গেছে মাত্র পাঁচটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাও ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে হয়েছে ২৫ হাজার ২২৭ মেগাওয়াট। মোট বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ৮ হাজার কিলোমিটার থেকে বেড়ে হয়েছে ১২ হাজার ৭৪৪ কিলোমিটার। গ্রিড সাবস্টেশন ক্ষমতা ১৫ হাজার ৮৭০ থেকে হয়েছে ৫০ হাজার ৭৪ এমভিএ। প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে ১ হাজার ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ভারত থেকে আমদানি করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ২ লাখ ৬০ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে ৬ লাখ ১২ হাজার। সেচ সংযোগ সংখ্যা ২ লাখ ৩৪ হাজার থেকে হয়েছে ৪ লাখ ৪৬ হাজার। এর মধ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)-এর গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ১৬ লাখ। ২০০৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে তারা ২ কোটি ৪০ লাখ গ্রাহকের ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছে। এর মধ্যে ৪০ লাখ ৫১ হাজার ৪৭৫টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। সোলার হোম সিস্টেমের সংখ্যা ৬০ লাখ।

বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ১৫ই জুলাই সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, আমরা গ্রিড এলাকার শতভাগ উপজেলায়, পৌরসভায় এবং গ্রামে বিদ্যুতায়নের কাজ শেষ করেছি। এখন অফ গ্রিড এলাকায় কাজ চলছে। যেমন দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে কিছু জায়গা, চর এলাকা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়ার মতো দ্বীপ অঞ্চল, ব্রহ্মপুত্র নদে অনেক চর জেগেছে। এসব জায়গায় সাবমেরিন ক্যাবল দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ করে দিচ্ছি। এ এলাকাগুলোয় এখন বিদ্যুতের যে চাহিদা তা ভবিষ্যতে তিন গুণ বৃদ্ধি পাবে। এজন্য এসব জায়গায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ লাগবে। দক্ষিণাঞ্চলের সব দ্বীপে বিদ্যুতায়ন হয়ে যাবে এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে। এ কাজ জুনে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও বিদেশ থেকে সাবমেরিন ক্যাবল আনতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। সেক্ষেত্রে দ্বীপ অঞ্চলগুলোয় এ বছরের মধ্যে বিদ্যুতায়নের কাজ শেষ হবে। আর পার্বত্য এলাকার যে ঘরে বিদ্যুতের তার বা সাবমেরিন পৌঁছানো যাবে না সেখানেও সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

**প্রতিবেদন : রিপা আহমেদ**

## নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

### রুট পারমিট ছাড়া বাসের বিরুদ্ধে অভিযান

১লা জুলাই থেকে ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত ঢাকায় রুট পারমিট ছাড়া বাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আতিকুল ইসলাম।

২৪শে জুন নগর ভবনের বুড়িগঙ্গা হলে রাজধানীর গণপরিবহণে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং যানজট নিরসনে গঠিত 'বাস রুট রেশনালাইজেশন' কমিটির ১৭তম সভা শেষে সাংবাদিকদেরকে এ কথা জানান তিনি।

ডিএনসিসি মেয়র বলেন, রাজধানী ঢাকায় বর্তমানে এক হাজার ৬৪৬টি বাস কোনো ধরনের রুট পারমিট ছাড়া চলাচল করছে। এসব বাসের জন্য নগরীতে সীমাহীন যানজট লেগে থাকে। এই বাসগুলো চলতে দেওয়া হবে না। ১লা জুলাই থেকে ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন ও বিআরটিএ অভিযান পরিচালনা করবে।

সভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র ও বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির সভাপতি শেখ ফজলে নূর তাপস, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথোরিটির (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম, রাজউক চেয়ারম্যান এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্লাহ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. মুহিবুর রহমান, গণপরিবহণ বিশেষজ্ঞ ড. এস এম সালেহ উদ্দিন, ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

**সারা দেশে চলবে গণপরিবহণ**

১১ই আগস্ট থেকে গণপরিবহণ শতভাগ যাত্রী নিয়ে চালু রাখার অনুমতি দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৮ই আগস্ট এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, অফিস-আদালাত ও দোকানপাট চালুর পাশাপাশি নির্দিষ্ট রুটে অর্ধেক গণপরিবহণ চলবে। তবে আসনের সমপরিমাণ যাত্রী বহন করতে পারবে।

৩রা আগস্ট অনুষ্ঠিত কোভিড-১৯ সংক্রমণের পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত, দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল রাখা এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিধিনিষেধের ধারাবাহিকতায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

**প্রজ্ঞাপনে যা আছে**

* সড়ক, রেল ও নৌপথে আসন সংখ্যার সমপরিমাণ যাত্রী নিয়ে গণপরিবহণ/যানবাহন চলাচল করতে পারবে। সড়কপথে গণপরিবহণ চলাচলের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন (সিটি করপোরেশন এলাকায় বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক) নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিদিন মোট পরিবহণ সংখ্যার অর্ধেক চালু করতে পারবে।

* সব ক্ষেত্রে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

* গণপরিবহণ, বিভিন্ন দপ্তর, মার্কেট ও বাজারসহ যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে অবহেলা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব বহন করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন**

## স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

### বিশ্বে ডেলটা ধরনের বিস্তার বাড়ছে

বিশ্বের বিভিন্ন অংশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ আবারও বাড়ছে। করোনার সংক্রমণ নতুন করে বৃদ্ধির জন্য অতি সংক্রামক ডেলটা ধরন ভূমিকা রাখছে। ৩০শে জুন *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস* এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, অনেক

*যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠানো ২৫০টি পোর্টেবল আইসিইউ ভেন্টিলেটর ২৪শে জুলাই ২০২১ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব লোকমান হোসেন মিয়া– পিআইডি*

দেশ ভেবেছিল তারা করোনায় সবচেয়ে বাজে পরিস্থিতি দেখে ফেলেছে। কিন্তু তারা এখন আবার করোনা সংক্রমণের ঊর্ধ্বগতি দেখছে, বিশেষ করে বিভিন্ন দেশে ডেলটা ধরনের বিস্তার বাড়ছে।

এদিকে *ওয়াশিংটন পোস্ট* এক প্রতিবেদনে জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের জৈবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মর্ডানা জানিয়েছে, তাদের তৈরি করোনা টিকা ডেলটা ধরনের বিরুদ্ধে কার্যকর। তাদের এ ঘোষণা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে কিছুটা আশা দেবে। কারণ, ইতোমধ্যে বিশ্বের ৯৬টি দেশে করোনার ডেলটা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে।

**ষাটোর্ধ্ব ১২ জনে ১ জন ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত**

দেশে ৬০ বছরের বেশি বয়সি ব্যক্তিদের প্রতি ১২ জনের মধ্যে ১ জন ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। পুরুষের তুলনায় নারীদের মধ্যে এর প্রকোপ বেশি। তাছাড়া যাদের স্ত্রী বা স্বামী নেই, সামগ্রিকভাবে ডিমেনশিয়ার প্রকোপ তাদের মধ্যে অন্যদের চেয়ে বেশি। ৩০শে জুন আইসিডিডিআরবি এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সের প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, নারীদের মধ্যে সমবয়সি পুরুষদের তুলনায় ডিমেনশিয়ার প্রকোপ আড়াই গুণ বেশি। আক্রান্ত ব্যক্তিদের অর্ধেকের বেশি (৫২ শতাংশ) উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত, হতাশায় ভোগেন ৫৪ শতাংশ এবং ৮ শতাংশের ডায়াবেটিস রয়েছে। বাংলাদেশের শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলের ২ হাজার ৭৯৬ জন ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তির ওপর গবেষণাটি চালানো হয়েছে। ডিমেনশিয়া হলে স্মৃতিশক্তি, চিন্তাভাবনা, আচরণ এবং প্রতিদিনের কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বব্যাপী প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের ডিমেনশিয়া রয়েছে।

**করোনা প্রতিরোধে নতুন এক চিকিৎসা পদ্ধতির সন্ধান লাভ**

করোনাভাইরাসের চিকিৎসায় বিজ্ঞানীরা এমন এক চিকিৎসা পদ্ধতির সন্ধান পেয়েছেন যা করোনাভাইরাসের পুনরুৎপাদন ঠেকাতে সফল হয়েছে। ইঁদুরের ওপর গবেষণা চালিয়ে তারা এ সফলতা পেয়েছেন। ৫ই জুলাই ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই গবেষণা প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে আন্তর্জাতিক সাময়িকি *প্রোসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স*-এ।

গবেষণায় বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত কিছু প্রাণীর শরীরে প্রোটিজ এনজাইমের একটি প্রতিরোধক (জিসি৩৭৬) প্রয়োগ করা হয়। এতে প্রাণীগুলোর বেঁচে যাওয়ার হার ব্যাপকভাবে বেড়েছে এবং এদের ফুসফুসে ভাইরাসের পরিমাণও কমেছে। এই প্রোটিজ এনজাইমের প্রতিরোধক হচ্ছে এক ধরনের অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ যা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ভাইরাল এনজাইমের বিস্তার প্রতিরোধ করে ভাইরাসের পুনরুৎপাদন ঠেকাতে দারুণভাবে সহায়ক।

**প্রতিবেদন : মো. আশরাফ উদ্দিন**

## যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

# ইউএস-বাংলা'র ফ্লাইট অভ্যন্তরীণ রুটে

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৬ই আগস্ট থেকে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ সকল রুটে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করেছে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সৈয়দপুর, যশোর, সিলেট, বরিশাল এবং রাজশাহী রুটে ফ্লাইট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স।

প্রতিষ্ঠানটি অভ্যন্তরীণ রুটে ৭২ আসনবিশিষ্ট ব্র্যান্ডনিউ এটিআর ৭২-৬০০ এয়ারক্রাফট দিয়ে ফ্লাইট পরিচালনা করবে। তাদের বিমান বহরে ৪টি বোয়িং ৭৩৭-৮০০, ৭টি ব্র্যান্ডনিউ এটিআর ৭২-৬০০সহ মোট ১৪টি এয়ারক্রাফট রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ রুট ছাড়াও ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের আন্তর্জাতিক রুট রয়েছে– কলকাতা, চেন্নাই, দুবাই, মাস্কাট, দোহা, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, ব্যাংকক ও গুয়াংজু।

টিকিট রিজার্ভেশনের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা– ০১৭৭৭৭৭৭৮০০-৬ অথবা ১৩৬০৫। ৫ই আগস্ট ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

**বঙ্গবন্ধু সেতুতে একদিনে পৌনে তিন কোটি টাকা টোল আদায়**

কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যেও বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে একদিনে ৩৭ হাজার ৯৪০টি গাড়ি পারাপার হয়েছে। এতে টোল আদায় হয়েছে দুই কোটি ৭৮ লাখ ৫৩ হাজার ৩১০ টাকা।

২রা আগস্ট এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বঙ্গবন্ধু সেতুর সাইট কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী আহসানুল কবীর পাভেল।

তিনি জানান, ১লা আগস্ট সকাল ৬টা থেকে ২রা আগস্ট সকাল ৬টা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব ও পশ্চিমের টোলপ্লাজা দিয়ে বাস, ট্রাক, লরি, পিকআপ, মাইক্রোবাস, প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেল মিলিয়ে ৩৭ হাজার ৯৪০টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। এতে সেতুতে টোল আদায় হয়েছে দুই কোটি ৭৮ লাখ ৫৩ হাজার ৩১০ টাকা।

এর মধ্যে সেতু পূর্ব টোলপ্লাজায় ২০ হাজার ৫৯৬টি পরিবহণের বিপরীতে টোল আদায় হয়েছে এক কোটি ৫৪ লাখ ১১ হাজার ৭২০ টাকা এবং সেতুর পশ্চিম টোলপ্লাজায় ১৭ হাজার ৩৪৪টি পরিবহণের বিপরীতে আদায় হয়েছে এক কোটি ২৪ লাখ ৪১ হাজার ৫৯০ টাকা।

যানবাহনের মধ্যে ঢাকামুখী পরিবহণের চেয়ে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলমুখী বেশি পরিবহণ সেতু পার হয়েছে।

**প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু**

## কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

# আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষকর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে কাজ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৫শে জুলাই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় মন্ত্রী বলেন, সরকার কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নে বদ্ধপরিকর। দেশে কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ছাত্র ও যুবসমাজকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকার আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষকর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষতা নিশ্চিত করা গেলে বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীর চাহিদার পাশাপাশি রেমিটেন্স প্রবাহও বৃদ্ধি পাবে।

**৩৮ হাজার ২৮৬ জন শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ**

১৫ই জুলাই বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) ওয়েবসাইটে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ করা হয়। সারা দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৫৪ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তির ফল প্রকাশ করেছে এনটিআরসিএ। এর আগে শিক্ষামন্ত্রীর হাতে ফলের অনুলিপি দেওয়া হয়। সুপারিশকৃত প্রার্থীরা এসএমএস পেয়েছে। http://ngi.teletalk.com.bd/ntrca/app/ ঠিকানায় ফল জানা যাবে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) সচিব এ টি এম মাহবুব-উল করিম বলেন, ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে পরে নির্বাচিত প্রার্থীদের মোবাইলে এসএমএস'ও দেওয়া হবে।

*ঢাকা জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে ৩রা জুলাই ২০২১ প্রবাসী কর্মীদের কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহণের নিবন্ধন কার্যক্রম– পিআইডি*

সারা দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৫৪ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের গণবিজ্ঞপ্তির বিপরীতে ৫১ হাজার ৭৬১টি পদে সুপারিশ করার কথা থাকলেও সুপারিশ করা হয়েছে ৩৮ হাজার ২৮৬ জন প্রার্থীকে। এর মধ্যে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ৩৪ হাজার ৬১০ জনকে এবং ননএমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ৩ হাজার ৬৭৬ জনকে সুপারিশ করা হয়েছে।

সুপারিশপ্রাপ্তদের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে এনটিআরসিএ। এ তালিকা পুলিশ ভেরিফিকেশনে পাঠানো হবে। এনটিআরসিএ থেকে জানা যায়, পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য প্রাথমিকভাবে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের সব তথ্য নেওয়া হয়েছে টেলিটক থেকে। পুলিশ ভেরিফিকেশন শেষ হওয়ার পরই চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

**প্রতিবেদন : ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ**

## সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

# শতবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' খ্যাত বাংলাদেশের প্রথম ও সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১লা জুলাই শতবর্ষ পূর্ণ হলো, পা দিল ১০১তম বর্ষে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও দিবসটি পালনে বেশ কিছু পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু প্রাণঘাতী করোনার কারণে ১লা জুলাই আপাতত ভার্চুয়ালি সীমিত পরিসরে উদ্‌যাপন করা হয় দিবসটি।

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে ১লা জুলাই ২০২১ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন। এতে মূল বক্তা হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক, কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবী সর্বজনশ্রদ্ধেয় আবদুল গাফফার চৌধুরী। ছবিতে উপাচার্যকে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে*

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আগামী ১লা নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শতবর্ষের মূল অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হওয়ার কথা রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সালের ১লা জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। প্রথমে তিনটি অনুষদ, ১২টি বিভাগ এবং ৮৪৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা শুরু। প্রতিষ্ঠার এই দিনটিতেই প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস হিসেবে পালিত হয়।

**বিশ্ব সংগীত দিবস**

জুন মাসের ২১ তারিখ বিশ্ব সংগীত দিবস। প্রতিবছর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বংলাদেশও বিশ্ব সংগীত দিবস নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালন করে থাকে। এটিকে ফরাসি ভাষায় বলে ফেট ডেলা মিউজিক আর বাংলায় বলে বিশ্ব সংগীত দিবস। এদিনে বিশ্বজুড়ে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন ধরনের গানের আসর, শিল্পী সমাবেশ, শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা, কর্মশালা ও সংগীত বিষয়ক নানা আনুষ্ঠানিকতা।

প্রতিবছরই বিশ্ব সংগীত দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলাদেশ সংগীত সংগঠন সমন্বয় পরিষদসহ সংগীতের বিভিন্ন সংগঠন যথাযোগ্য মর্যাদায় বর্ণিল আয়োজনে দিবসটি পালন করে। এ বছর করোনা মহামারির কারণে অনলাইনে অনুষ্ঠান আয়োজনেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

বাংলাদেশ সংগীত সংগঠন সমন্বয় পরিষদ ২০০৭ সালে প্রথম এ দিনটি পালন শুরু করে। এ বছর ২১-২৭শে জুন প্রতিদিন রাত আটটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। এবারের আয়োজনে ৪০টি সংগীত দল অংশ নেয়।

বিশ্ব সংগীত দিবসের এবারের স্লোগান– 'সংগীত হোক বৈশ্বিক মহামারি নির্মূলের হাতিয়ার'। অনুষ্ঠান আয়োজনের সাতদিন সাতজন গুণী আলোচক– তপন মাহমুদ, মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, কবি আমিনুল ইসলাম, শেখ সাদী খান, ম হামিদ, চিত্রশিল্পী মতলুব আলী ও ড. মোহাম্মদ সাদিক অংশ নেন।

**প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা**

## চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

# চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন পাস

জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০২১' পাস হয়েছে। এর ফলে চলচ্চিত্র শিল্পীদের কল্যাণে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলো।

৩রা জুলাই একাদশ জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশনে বিলটি পাসের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

বিলের ওপর জনমত যাচাই, বাছাই কমিটিতে পাঠানো এবং সংশোধনের প্রস্তাবগুলো আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি হয়। স্পিকার বিলটি পাসের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে দিলে অধিকাংশ সংসদ সদস্যের 'হ্যাঁ' ভোটে বিলটি পাস হয়।

**৭৪তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে *রেহানা মরিয়ম নূর***

বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ৭৪তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের সিনেমা নির্মাতা আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদের পরিচালনায় *রেহানা মরিয়ম নূর* প্রশংসিত হয়েছে। কান চলচ্চিত্র উৎসবে অফিশিয়াল সিলেকশনে প্রথম বাংলাদেশি সিনেমা এটি। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নতুন ইতিহাস গড়ে।

চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের পর *রেহানা মরিয়ম নূর* সিনেমায় নাম ভূমিকায় অভিনয়কারী আজমেরী হক বাঁধনকে নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক রেহানা মরিয়ম নূরকে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি।

*রেহানা মরিয়ম নূর* ছবিটি কানের ডবসি থিয়েটারে ৭ই জুলাই প্রদর্শন হয়। প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা ব্যাপ্তির এই সিনেমাটির শুরু থেকে শেষ অবধি হলভর্তি দর্শক দেখেছেন পিনপতন নীরবতায়। শেষ হওয়ার পর দর্শক দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং হাততালিতে মুখরিত করেন ডবসি থিয়েটার।

ছবিটিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন আজমেরী হক বাঁধন। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে আছেন– সাবেরী আলম, আফিয়া জাহিন জায়মা, আফিয়া তাবাসসুম বর্ণ, কাজী সামি হাসান, ইয়াছির আল হক, জোপারি লুই, ফারজানা বীথি, জাহেদ চৌধুরী মিঠু, খুশিয়ারা খুশবু অনি, অভ্রদিত চৌধুরী।

**প্রতিবেদন : মিতা খান**

## মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

# জিরো টলারেন্স নীতি

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে যেমন আমরা জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছি, জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে সম্পূর্ণ দমন করতে না পারলেও নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছি, ঠিক তেমনি মাদকের বিরুদ্ধে সমাজের সবাইকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তবেই মাদক নির্মূলের মাধ্যমে সুন্দর সমাজ গড়া সম্ভব।

২৬শে জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২১ উপলক্ষে ভার্চুয়ালি এক আলোচনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অনলাইন জুম মিটিংয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, মাদকের পাচার একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এ সমস্যার কারণে বাংলাদেশ চরম হুমকির মুখে পড়েছে। মাদকের কুচক্রীদের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দুর্বার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরটি মাদক নিয়ন্ত্রণে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। আমরা ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইনসহ অন্যান্য মাদক সম্পর্কে জানি। কিন্তু বর্তমানে নতুন নতুন মাদকের আবির্ভাব হচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠে নজরদারি করছে।

নিরাময় কেন্দ্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনায় মাদক নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। আগে একটি অচল ছিল। পরে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট করা হয়েছে। এখন এটি ১৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। আমরা প্রতিটি বিভাগে ও জেলায় একটি করে মাদক নিরাময় কেন্দ্র তৈরির বিষয়ে কাজ করছি।

সর্বস্তরে ডোপ টেস্ট জরুরি উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাজীবন থেকে শুরু করে চাকরিজীবনে, চাকরিতে প্রবেশের শুরুতে সর্বক্ষেত্রে যদি ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়, তবে মাদকের আগ্রাসন কমে যাবে।

**প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন**

## ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

# করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পীদের আর্থিক অনুদান

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্থায়নে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৩৩ জন শিল্পীকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ৫ই আগস্ট জেলা পরিষদের সভাকক্ষে খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি দীপংকর তালুকদার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব নগদ অর্থ প্রদান করেন।

*করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পীদের মাঝে আর্থিক অনুদান প্রদান করছেন সভাপতি দীপংকর তালুকদার*

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে দীপংকর তালুকদার বলেন, পরিষদের পক্ষ থেকে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৩৩ জন শিল্পীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আর্থিক মূল্যে এ সাহায্য খুব বেশি না হলেও শিল্পীদেরকে সাহস জোগানোর জন্যে এ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, রাঙামাটিতে করোনায় বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে নরসুন্দররা আগে তাদের কাজ হারিয়েছেন। এরপর পর্যটন সংশ্লিষ্ট বোট চালকরা। আমরা সরকারের সাহায্য তাদের হাতে পৌঁছে দিয়েছি।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অংসুইপ্রু চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহা. আশরাফুল ইসলাম, পরিষদ সদস্য বিপুল ত্রিপুরা, রেমলিয়ানা পাংখোয়া, সবির কুমার চাকমা, প্রবর্তক চাকমা, ঝর্ণা খীসা, প্রিয়নন্দ চাকমাসহ শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন।

**বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নাইক্ষ্যংছড়ির সব রাস্তাঘাট দ্রুত মেরামত**

ঘুমধুম, তুমব্রুসহ নাইক্ষ্যংছড়ির ক্ষতিগ্রস্ত সব রাস্তাঘাট দ্রুত মেরামত করা হবে বলে জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। ৫ই আগস্ট ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে সম্প্রতি সীমান্তের তুমব্রু গ্রামে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা ও পাহাড় ধসে ছয়শ ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বন্যায় যেসব ধানি জমির ক্ষতি হয়েছে এসব এলাকায় সেচ পাম্প, ধান মাড়ানি, স্প্রে মেশিন সব দেওয়া হবে। পাহাড়ে হবে কপি ও কাজুবাদাম। এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ থাকবে না।

**প্রতিবেদন : আসাব আহমেদ**

## শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

# শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করছে বাংলাদেশ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, আজকের শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। তাদের উন্নয়নে সরকার শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়ন, দুই কোটি শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে বই প্রদান ও স্কুলে মিড-ডে মিল চালু করেছে। সরকার মা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গর্ভাবস্থা থেকে তিন বছর পর্যন্ত ১১ লাখ দরিদ্র কর্মজীবী ও দরিদ্র মাকে ভাতা প্রদান করছে। ২০২৪ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১২.৪ শতাংশ ও অতি দারিদ্র্যের হার ৪.৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে সরকার। ২৪শে জুলাই চীনের বেইজিং-এ চায়না ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ ফাউন্ডেশন আয়োজিত ভার্চুয়ালি 'দারিদ্র্য বিমোচন ও শিশু উন্নয়নে সপ্তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স'-এ প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সরকার 'শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশে সমন্বিত নীতি ২০১৩' বাস্তবায়ন করছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সফলভাবে এমডিজি অর্জন করেছে। এসডিজি গোল-৪-এর গুণগত শিক্ষা ও শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে জাতিসংঘের এসডিজি অর্জনে বিশ্বের যে তিনটি দেশ সবচেয়ে এগিয়ে আছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

ফজিলাতুন নেসা আরও বলেন, মহামারি করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সরকার সারা দেশে একযোগে গণটিকাদান কর্মসূচি শুরু করেছে। করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছে। যার মধ্যে শিশুর পুষ্টি ও উন্নয়নে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ রয়েছে। এছাড়া বিশ্বব্যাপী শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশে ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, সিডিআরএফ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাকে গবেষণা, অংশীদারিত্ব ও কৌশলগত সাহায্যের মাধ্যমে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চীনের শিক্ষা মন্ত্রী Chen Baosheng, কম্বোডিয়ার শিক্ষা ও যুব মন্ত্রী Hang Chuon Naron, লাওসের শিক্ষা ও ক্রীড়া মন্ত্রী Phouth Simmalavong, নেপালের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী কৃষ্ণ গোপাল শ্রেষ্ঠ ও চায়না ন্যাশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর রুরাল রিভাইটালেজেশনের মহাপরিচালক Wang Zhengpu। কনফারেন্সের এবারের প্রতিপাদ্য– 'টেকসই সমৃদ্ধির জন্য শিশুদের ওপর বিনিয়োগ'।

**প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন**

## প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

# দুই প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী পেল দুই লাখ টাকা পুরস্কার

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে দুই প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এক লাখ টাকা করে মোট দুই লাখ টাকা পেয়েছে। পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ শুভেচ্ছা কার্ডে পাবনার বেড়া উপজেলার দুই প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর আঁকা ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল। তাই ছবি আঁকার পুরস্কার হিসেবে ওই দুই শিক্ষার্থীকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে এক লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ৩০শে জুন এ পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

প্রতিবন্ধী ওই দুই শিক্ষার্থী হচ্ছে– উপজেলার রতনগঞ্জ গ্রামের সাঈদ মিয়ার ছেলে হৃদয় মিয়া (১৪) ও মাশুমদিয়া মধ্যপাড়া গ্রামের আলিম খানের মেয়ে রুপা খাতুন (১২)। তারা উপজেলার মাসুমদিয়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন মীরপুর গ্রামের সুপ্ত শিখা প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী। ১৫ই জুন প্রধানমন্ত্রীর অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'পবিত্র ঈদুলফিতর ২০২১ শুভেচ্ছা কার্ডে ব্যবহৃত আপনার আঁকা ছবির সম্মানী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে এককালীন এক লাখ টাকা দিয়েছেন। এ অবস্থায় আপনার অনুকূলে প্রস্তুতকৃত চেক এ কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করার অনুরোধ করা হলো।' একই চিঠি দুই শিক্ষার্থীর নামে আলাদাভাবে পাঠানো হয়েছে। ৩০শে জুন এই চিঠি হাতে পান বেড়ার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা কমিটি।

জানা যায়, সারা দেশে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা হয়েছিল। এরই অংশ হিসেবে ওই সময় বেড়া উপজেলাতেও এ ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে তাদের বিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী তাতে অংশ নেয়। পরে তৎকালীন ইউএনও আসিফ আনাম সিদ্দিকী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী হৃদয় ও রুপার ছবি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠান। শেষ পর্যন্ত পাঠানো সেই ছবি দুটি প্রধানমন্ত্রীর গত ঈদুলফিতরের ঈদ শুভেচ্ছা কার্ডে ব্যবহৃত হয়।

**২০০ জন দৃষ্টি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী পেলেন ত্রাণ ও ঈদ উপহার**

ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ২০০ জন দৃষ্টি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত খাবার ও ঈদ সামগ্রী তুলে দেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী

লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কচি ও স্থানীয় নব নির্বাচিত ১৪ আসনের সাংসদ আগা খান মিন্টু। ৯ই জুলাই রাজধানীর মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মিরপুর-১-এ খাবার ও ঈদ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

**কক্সবাজারে প্রতিবন্ধীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ**

কক্সবাজার সদর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুই শতাধিক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ করা হয়েছে। ১০ই জুলাই কক্সবাজার সদর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক মো. মামুনুর রশীদ। জনপ্রতি ১০ কেজি করে চাল, দুই কেজি ডাল, এক লিটার তেল, এক কেজি লবণ, এক কেজি চিনি ও এক কেজি ছোলা দেওয়া হয়।

**প্রতিবেদন: অমিত কুমার**

*প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত খাবার ও ঈদ সামগ্রী তুলে দেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কচি ও স্থানীয় নব নির্বাচিত ১৪ আসনের সাংসদ আগা খান মিন্টু*

## ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

# তিন ফরমেটেই বাংলাদেশের জয়

জিম্বাবুয়ে সফরে টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজের পর টি-টুয়েন্টি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। যদিও টি-টুয়েন্টি সিরিজ চ্যালেঞ্জিং ছিল, তবে শেষ পর্যন্ত জয় টাইগারদেরই। হারারেতে একমাত্র টেস্টে ২২০ রানে জিতে সফরকারীরা। বাংলাদেশের দেওয়া ৪৭৭ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে পঞ্চম দিনে দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৬ রানে

অলআউট হয়ে যায় জিম্বাবুয়ে। লিটন দাস, সাকিব আল হাসান এবং তামিমের নৈপুণ্যে ওয়ানডে সিরিজ জয় করে বাংলাদেশ। ওয়ানডেতে সিরিজ সেরা হন সাকিব। টি-টুয়েন্টিতে সিরিজ সেরা হন সৌম্য সরকার। একমাত্র টেস্টে সেরা হন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। ২৫শে জুলাই বাংলাদেশের জিম্বাবুয়ে সফর শেষ হয়।

**ব্রাজিলকে হারিয়ে কোপার শিরোপা জয় মেসিদের**

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়ে ১১ই জুলাই কোপা আমেরিকার শিরোপা ঘরে তুলেছে আলবিসেলেস্তেরা। সেই সঙ্গে কোপায় সবচেয়ে বেশি (১৫টি) শিরোপা জেতার রেকর্ডে উরুগুয়ের সঙ্গী হলো আর্জেন্টিনা। ফলে শিরোপার জন্য আর্জেন্টিনার দীর্ঘ ২৮ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। এর আগে সর্বশেষ ১৯৯৩ সালে কোপা তথা বড়ো কোনো টুর্নামেন্টের শিরোপা জেতার স্বাদ পেয়েছিল তারা।

টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা– দুটো সেরা পুরস্কারই উঠল মেসির হাতে। কোপা আমেরিকায় লিওনেল মেসি ফাইনালসহ মোট ৭টি ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে ৫টি ম্যাচেরই ম্যাচ সেরা হয়েছেন। গোলও করেছেন সর্বোচ্চ ৪টি। অ্যাসিস্ট করেছেন ৫টি। তার নিকটে থাকা লওতারো মার্টিনেজ ফাইনালে গোল পাননি। ফলে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বল এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বল দুটো সেরা পুরস্কারই উঠল মেসির হাতে।

**ইউরো কাপের শিরোপা জিতল ইতালি**

২০০৬ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইতালি। সেবার আজ্জুরিদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রক্ষণভাগের ফ্যাবিও ক্যানাভারো। ১৯৬৮ সালের পর দ্বিতীয়বার ইউরো চ্যাম্পিয়ন হলো ইতালি। এবার আজ্জুরিদের নেতৃত্ব দিলেন ডিফেন্ডার জর্জিও কিয়েলিনি। লন্ডনের ওয়েম্বলিতে ১১ই জুলাই বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ১টায় শুরু হওয়া ম্যাচে টাইব্রেকারে ২-৩ গোলে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ৫৩ বছর পর শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছে রবার্তো মানচিনির ইতালি। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র ছিল। ২ মিনিটে ইংল্যান্ডের লুক শ' এবং ৬৭ মিনিটে ইতালির লিওনার্দো বোনুচ্চি গোল করেন। টাইব্রেকারে ইতালি দ্বিতীয় ও পঞ্চম শট মিস করে এবং স্বাগতিক ইংল্যান্ড মিস করে শেষ তিনটি শট। এ নিয়ে টানা ৩৪ ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়ল ইতালি।

**প্রতিবেদন : মো. মামুন হোসেন**

# চলে গেলেন গণসংগীতশিল্পী ফকির আলমগীর

**আফরোজা রুমা**

একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা, গণসংগীতশিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা ফকির আলমগীর করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২৩শে জুলাই চলে গেলেন না ফেরার দেশে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

১৯৫০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার কালামৃধা গ্রামে ফকির আলমগীরের জন্ম। কালামৃধা গোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ ভর্তি হন। সেখান থেকে স্নাতক শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর লাভ করেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি জড়িয়ে যান রাজনীতিতে। ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী ও গণশিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে তাঁর গানের জগতে প্রবেশ। তারপর এল উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের উত্তাল সময়। শিল্পী ফকির আলমগীর তাতেও কণ্ঠ মেলালেন। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যোগ দেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। তখন তাঁর বয়স ছিল ২১ বছর। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কলকাতার নারিকেল ডাঙায় শরণার্থী শিল্পী গোষ্ঠীতে যোগ দেন ফকির আলমগীর। সাবেক মন্ত্রী এমএ মান্নান ছিলেন সেই সংগঠনের দলনেতা। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে দেশজ সুরের মেলবন্ধ ঘটিয়ে বাংলা পপগানের বিকাশে মেতে উঠে তরুণ শিল্পীদের একটি দল। আজম খান, ফিরোজ সাঁই আর ফেরদৌস ওয়াহিদের সঙ্গে ফকির আলমগীরও তখন পপগানে উন্মাদনা ছড়িয়েছিলেন শ্রোতাদের মাঝে।

ফকির আলমগীরের গণমানুষের শিল্পী হয়ে ওঠার পেছনে বড়ো ভূমিকা ছিল যে গানের চরিত্রের, তার নাম সখিনা। ১৯৮২ সালে বিটিভি'তে ঈদের আনন্দমেলায় 'ও সখিনা গেছস কিনা ভুইলা আমারে'–গানটি প্রচারের পর দর্শকদের মাঝে সাড়া পড়ে যায়। নব্বইয়ের দশকে সামরিক শাসনবিরোধী গণ-আন্দোলনে প্রতিবাদী গানে ফকির আলমগীরের সরব উপস্থিতি তাঁকে তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয়তার নতুন মাত্রায় নিয়ে যায়। তবে তার আগেই মাকে নিয়ে লেখা তাঁর আরেকটি গান মানুষের মুখে মুখে ফিরত। 'মায়ের একধার দুধের দাম'–গানটি সিনেমাতেও ব্যবহৃত হয়েছিল। 'মন আমার দেহ ঘড়ি', 'আহারে কাল্লু মাতব্বর', 'ও জুলেখা', 'ঘর করলাম না রে আমি', 'সান্তাহার জংশনে দেখা', 'বনমালী তুমি'সহ তাঁর গাওয়া বহু গান আশি ও নব্বইয়ের দশকে দারুণ জনপ্রিয় ছিল। গানে গানে গণমানুষের কথা বলার প্রতিজ্ঞা থেকেই ফকির আলমগীর গেয়েছেন 'ধোঁয়ায় ছেয়েছে গাজার আকাশ', আবার সাভারের রানা প্লাজা ট্রাজেডিও তাঁর গানে এসেছে।

নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মদিন উপলক্ষে গাওয়া একটি গান ছিল ফকির আলমগীরের নিজের কাছেই প্রিয়। ১৯৯৭ সালের মার্চে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নেলসন ম্যান্ডেলা যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন, সে সময় তাঁকে নিয়ে লেখা সেই 'কালো কালো মানুষের দেশে'– গানটি শুনিয়েছিলেন ফকির আলমগীর।

ফকির আলমগীর সাংস্কৃতিক সংগঠন ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। গণসংগীত চর্চার আরেক সংগঠন গণসংগীতশিল্পী পরিষদের সভাপতি এবং সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সহসভাপতির দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। গানের পাশাপাশি নিয়মিত লেখালেখির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এই শিল্পী। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও বিজয়ের গান, গণসংগীতের অতীত ও বর্তমান, আমার কথা, যারা আছেন হৃদয় পটে'সহ বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ হয়েছে তাঁর। বাংলাদেশের গণসংগীতে অবদানের জন্য ১৯৯৯ সালে ফকির আলমগীরকে একুশে পদক দেয় সরকার। এছাড়া শেরেবাংলা পদক, ভাসানী পদক, জসীমউদ্‌দীন স্বর্ণপদক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্মাননা সিকোয়েন্স অ্যাওয়ার্ড অব অনার, তর্কবাগীশ স্বর্ণপদক, কান্তকবি পদক, গণনাট্য পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মহাসম্মাননা, ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় পুরস্কার, ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড যুক্তরাষ্ট্র, জনসংযোগ সমিতি বিশেষ সম্মাননা ও বাংলা একাডেমি সম্মানসূচক ফেলোশিপ পান তিনি।

গণসংগীতশিল্পী ফকির আলমগীরের মরদেহ ২৪শে জুলাই বেলা ১১টায় খিলগাঁওয়ের পল্লীমা সংসদে প্রথম জানাজার আগে ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করা হয়। এরপর সর্বস্তরের জনসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দুপুর ১২টায় তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে লাল-সবুজের পতাকায় মুড়িয়ে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে সেখানে ফুলেল শ্রদ্ধায় মুক্তিযোদ্ধা এই শিল্পীকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানায় সর্বস্তরের জনসাধারণ। শহিদমিনারে শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানায় রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন সামাজিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

# নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
**google play store**-এ
**nobarun** লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
**e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd**

# Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

**Bangladesh Quarterly**
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

# অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

**সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)**
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
**তথ্য ভবন**
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

# সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 42, No. 02, August 2021, Tk. 25.00

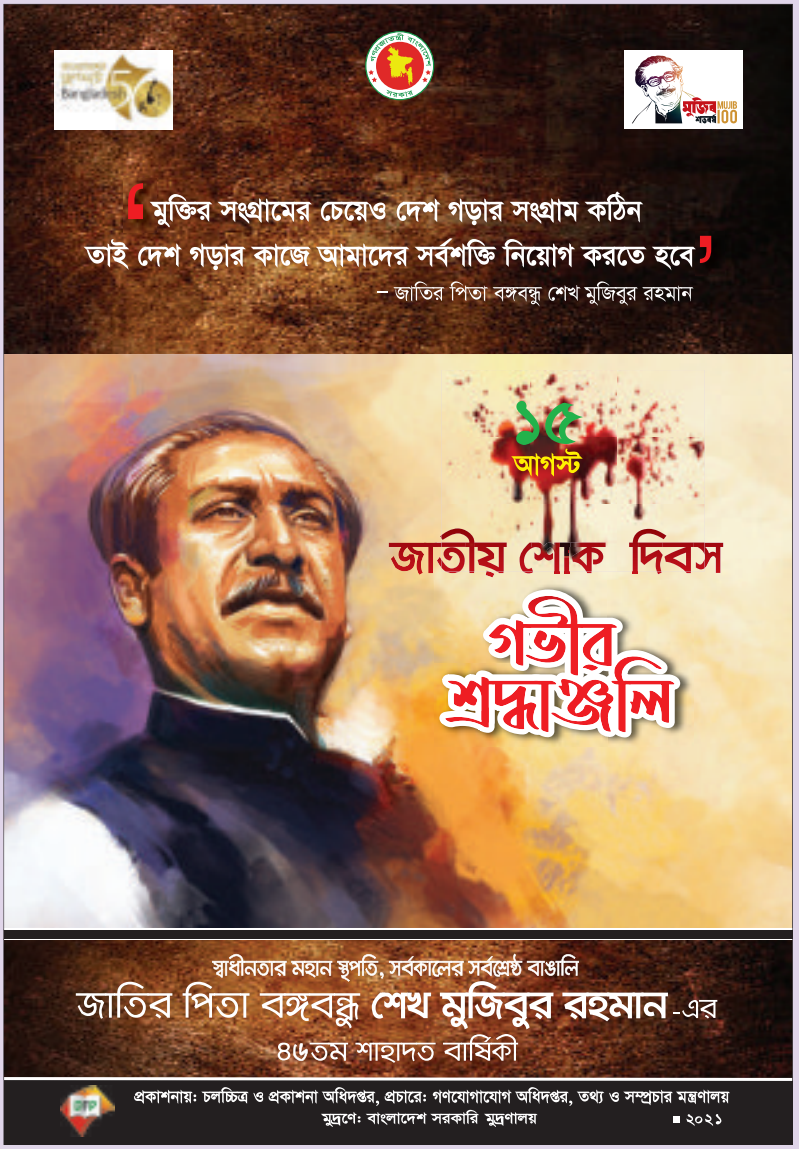


চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
**তথ্য ভবন**
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd